রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য,
এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্) ; ডি. ফিল্. ;
কাব্যপুরাণতীর্থ সাহিত্যভারতী,



চলন্তিকা
৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৬

প্রকাশক :
চলন্তিকার পক্ষে
শ্রীকরুণা বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. (অনার্স) ; বি. টি.
রেজি. অফিস, নবদ্বীপ—নদীয়া

RABINDRA SAHITYE ARSA PRABHAB
by Dr. Hansanarayan Bhattchrayya, a thesis Published by Karuna Bandyopadhay for and on behalf of Chalantika Regd. Office—Nabadwip, Nadia, May—1969

Rs. 12·00

প্রচ্ছদ :
ধীরাজ দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মূল্য : বারো টাকা

আচার্য সুকুমার সেন

এম্. এ. ; পি. এইচ. ডি.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

লেখকের অন্য বই

যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়

(যাত্রাগানের উদ্ভব থেকে থিয়েট্রিকাল অপেরার
সূচনা পর্য্যন্ত যাত্রাগানের বিচিত্র ইতিহাস)

সূচীপত্র

নিবেদন

আর্ষ প্রভাব অর্থে ঋষির প্রভাব। রবীন্দ্র সাহিত্যে ঋষি প্রবর্তিত শাস্ত্র এবং ধ্যান ধারণার প্রভাব আলোচনাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের ঋষি প্রবর্তিত জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ঋষি রচিত শাস্ত্ররাজি অফুরন্ত— অনন্ত। এই গ্রন্থের লক্ষ্য প্রধানতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের উপরে বৈদিক জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রভাব আলোচনা করা। এই আলোচনায় ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ভাগই প্রধানতঃ প্রভাবের উৎস হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এগুলি সাধারণতঃ ঋষি প্রবর্তিত অথবা ঋষি প্রণীত বলেই এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে। যেগুলি ঋষি প্রবর্তিত বা রচিত নয়, ভারতীয় ঋষির চিরন্তন জ্ঞান-সাধনার অনুবর্তনই এই সকল গ্রন্থে দেখা যায়। কোথাও কোথাও বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য ইত্যাদিরও অল্প স্বল্প আলোচনা আছে। এ সকল ক্ষেত্রেও বৈদিক চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বৈদিক ঋষির দিব্য জ্ঞানের জ্যোতি ভারতের সকল ধ্যান ধারণা ও চিন্তাকে আলোকিত করেছে চিরকালই। যুগে যুগে চিন্তায় যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তা ঐ জ্ঞানরাশির নব নব ভাষ্য-ভাষ্যান্তর মাত্র। এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ড মূর্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও রচনায়। তাঁর বিপুল সৃষ্টির মধ্যে ঋষি কবির চিন্তার তাত্ত্বিক অংশটুকুমাত্রই নয় আর্ষ শাস্ত্র ও কাব্যের কাহিনী, রূপকল্প প্রভৃতিও স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিভিন্ন স্তরে বিদেশী মনীষীদের চিন্তা অপেক্ষা ভারতীয় ঋষির সাধনালব্ধ জ্ঞানের প্রভাব যে স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে সেটুকু প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কতটুকু সফল হয়েছি তা সুধীজন বিচার করবেন।

গ্রন্থখানি লিখেছিলাম ১৯৬০ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর পূর্বে। ভেবেছিলাম কবির জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বহু গ্রন্থই ত প্রকাশিত হচ্ছে এবং হবে। তন্মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র পুষ্পোপহার কি একটু স্থান পাবে না? রাজেন্দ্র সংগমে দীনের তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ত চরিতার্থ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বই লেখা ও প্রকাশনার মধ্যে অনেক স্রোত বয়ে যায়। প্রকাশনার জন্য সামান্যতম প্রয়াস করেছিলাম, তাতে সফল হইনি।

ইতোমধ্যে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস প্রকাশিত হ'লো। একই বিষয়বস্তুর আলোচনা ভেবে ছাপবার ইচ্ছাও ত্যাগ করলাম। পরে অবশ্য ডঃ দাশগুপ্তের গ্রন্থ পড়ে মনে হয়েছিল যে আমার বই ছাপানো চলে। কিন্তু ছাপাবার জন্য কোন প্রয়াস আর করি নি।

বৎসর দুয়েক পূর্বে—তখন আমার অপর গ্রন্থ "যাত্রাগানে মতিলাল রায়" ছাপানো চলছে। চলন্তিকার কর্ণধার বিশ্বনাথবাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থখানির উল্লেখ করেছিলাম। বিশ্বনাথবাবু তৎক্ষণাৎ বইটি প্রকাশ করতে আগ্রহী হলেন। দু মাস পরে গ্রীষ্মাবকাশে তিনি আমার বাড়ীতে পত্র মারফতে তাগাদা দিলেন পাণ্ডুলিপি **ready** করে দিতে। সুতরাং খুবই তাড়াতাড়ি পাণ্ডুলিপি তৈরী করলাম। বলাবাহুল্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার সময়ে গ্রন্থটি কিয়দংশে পরিমার্জিত এবং কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ধিত হয়েছে। অবশ্য বিশ্বনাথবাবু গ্রন্থটি যন্ত্রস্থ করতে বেশ কিছু বিলম্ব করলেন এবং এর যন্ত্রমুক্তি ঘটতেও কম সময় লাগলো না। তৎসত্ত্বেও একমাত্র তাঁর জন্যই বিলুপ্তির অপচয় থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে এবং যন্ত্র মুক্ত হয়ে সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত হতে পেরেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশনার সবটুকু কৃতিত্বই বিশ্বনাথ বাবুর। পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে চলন্তিকা নবাগত হলেও প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকবর্গের সাহসিকতাকে সাধুবাদ দিতেই হয়। প্রতিষ্ঠানটির জয়যাত্রা কামনা করি।

এই গ্রন্থ রচনাকালে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থরাজি স্বেচ্ছামত ব্যবহার করতে পেরেছি। এজন্য গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগ্‌চী এবং গ্রন্থাগারিক শ্রী যশোদা গোপাল গোস্বামী আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

যথেষ্ট যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো গেল না। শুদ্ধিপত্র তাই দীপশিখার সঙ্গে ধূম্রপুঞ্জের মত সংশ্লিষ্ট হয়ে রইলো।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রাম—মীরহাট
পোঃ—বৈদ্যপুর
জেলা—বর্ধমান

রবীন্দ্র জন্মতিথি ১৩৭৬ সাল।

প্রথম অধ্যায়

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ

ভারত-আত্মার প্রাণ-স্পন্দন রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং কাব্যে। ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-সাধনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, রবীন্দ্র চিন্তায় এবং সাহিত্যে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনটি আর ইতঃ পূর্বে কখনও ঘটে নি। এই দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের ঋষি সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা। "দ্রষ্টৃত্বাৎ ঋষিত্বম্"[১]। যুগের অবসানে বেদ অন্তর্হিত হ'লে পুনঃ সৃষ্টির পরে বেদের জ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করলেন ঋষিরা। স্বয়ম্ভু বেদ-পুরুষের অনুগ্রহে তপস্যারত মুনিদের নিকট বেদের জ্ঞান আবির্ভূত হয়। নূতন যুগে অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় বেদকে তাঁরা প্রথম দর্শন করেন বলে তাঁহাদের বলা হয় ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা। "বেদ-প্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুষ্ঠিতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভুর্বেদ পুরুষঃ প্রাপ্নোৎ। তথা চ শ্রূয়তে অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্য-মানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ অভ্যানর্ষত্তদ্ ঋষয়োঽ-ভবন্ ইতি (তৈঃ আঃ ২—৬)। তথাতীন্দ্রিয়স্য বেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতো দর্শনাদৃষিত্বমিত্যভিপ্রেত্য স্মর্যতে,—

> "যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
> লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।"[২]

বহুশতাব্দী পরে বেদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নতুন ক'রে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। কবির তপস্যায় যুগান্তে অন্তর্হিত (বিস্মৃত) বেদ-মন্ত্র নব-কায়া পরিগ্রহ করলো। ভারত—আত্মার শাশ্বত বাণী লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ হলেন ঋষি।

উপনিষদ্ বলেছেন, বাকই (শব্দ) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বস্তু, বাক্ই শ্রেষ্ঠ রস, বাক্

---

১ সায়ন ভাষ্য—ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১ম সূক্ত।

২ ঐ ঐ

ব্রহ্ম, বাক্ বেদ, বাক্ বেদের সার-প্রণব। "এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপামোষধয়ঃ রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ। পুরুষস্য বাগ্ রসঃ, বাচঃ ঋগ্ রসঃ, ঋচঃ সামরসঃ। সাম্নঃ উদ্গীথো রসঃ।"[১]

—পৃথিবী এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; জলসমূহ পৃথিবীর সার, জলসমূহের সার ওষধী, ওষধী সমূহের সার বাক্ (শব্দ), বাক্যের সার ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদের সার সামবেদ, সামবেদের সার উদ্গীথ (উদগীথাবয়ব ওঁকার)।[২]

পুরুষের সার বাগ্ব্রহ্মের যিনি স্রষ্টা—বাগ্ব্রহ্মের যিনি দ্রষ্টা—বাক্ যাঁর আয়ত্তে,—তিনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ,—তিনিই ক্রান্তদর্শী ঋষি।

রবীন্দ্রনাথ কবি। বেদে ঋষি এবং কবি শব্দ প্রায় সমার্থক। সায়নাচার্য লিখেছেন, "কবি শব্দোঽত্র ক্রান্তবচনো নতু মেধাবী নাম।"[৩] কবি শব্দের অর্থ 'ক্রান্ত' বা অতিক্রান্ত। অর্থাৎ বর্তমান অতিক্রান্ত যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ভূতে, ভবিষ্যতে, তিনিই কবি। যিনি স্রষ্টা, তিনি কবি পদবাচ্য। কিন্তু স্রষ্টা হ'লেই কবি সংজ্ঞা লাভের অধিকারী হবেন না। চাই বর্তমান-অতিক্রান্ত দর্শন। যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি সকল মালিন্য সকল জড়তা, সকল সংকীর্ণতার পারে ভূতে ভবিষ্যতে প্রসারিত তিনিই অধিকারী কবিসংজ্ঞার। ঋগ্বেদের ঋষি অগ্নি, মিত্র, ব্রহ্মণস্পতি, বিশ্পতি প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাকে কবি সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন।

"অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ"[৪]—অগ্নি যজ্ঞের হোতা ক্রান্তকর্মা (অথবা ক্রান্তপ্রজ্ঞ)।

"কবিঃ কবিত্বা দিবিরূপমাসজৎ।"[৫]—ক্রান্তদর্শী মিত্র কবিত্বের (ক্রান্তদর্শনের) দ্বারা দ্যুলোকে নিজের তেজ বিস্তার করেন।

"গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপশ্রবস্তমম্"।[৬]—হে ব্রহ্মণস্পতে, দেবগণসম্বন্ধীয় গণের অধিপতি ক্রান্তদর্শিগণের ও ক্রান্তদর্শী, অন্নদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমাকে আহ্বানকরি।

১ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।১।২।
২ দুর্গাচরণ সংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।
৩ ঋগ্ভাষ্য ১।১।৫।
৪ ঋগ্বেদ— ১।১।৫।
৫ ঋগ্বেদ—১০।১২৪।৭
৬ ঐ —২।২৩,১।

"কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"।[১] আচার্য শংকর কবি শব্দের ব্যখ্যায় লিখিছেন, "কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্বদৃক্। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা ইত্যাদি শ্রুতেঃ।"২ —যিনি সর্বদর্শী—যাঁর অপেক্ষা দ্রষ্টা নেই, তিনিই কবি।

রবীন্দ্রনাথও বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে 'কবি' আখ্যা দিয়েছেন।

আমি বললেম,
বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে—
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ
বাঁশির থেকে ধ্বনি।[৩]

পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ, আপন হাতের আঁকা ছবি।[৪]

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বিশ্বস্রষ্টার কবিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, "এইজন্যই তাঁকে ঋষিরা বলেছেন 'কবিঃ'। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত ক'রে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত ক'রে তুলছে, তিনিও তেমনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত ক'রে, বহুর সংগে যুক্ত ক'রে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন,—নইলে সমস্তই অর্থহীন হ'ত।"[৫]

বিশ্বকবি স্বয়ম্ভূর করুণায় তাঁর কবিত্বের কণামাত্র যিনি লাভ করেন, এই সংসারে তিনিও কবিসংজ্ঞার অধিকারী হন। বিশ্বস্রষ্টা সর্বদর্শী বিশ্বকবির কবিত্বের কণিকা লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথও কবি, স্রষ্টা, ক্রান্তদর্শী, বিশ্বকবির আশীর্বাদ পেয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ধন্য।

---

১ ঈশোপনিষৎ ৮।
২ ঐ —ভাষ্য।
৩ ত্রিশ,— শেষ সপ্তক।
৪ ১২,— জন্মদিনে।
৫ পার্থক্য—শান্তিনিকেতন।

বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে
তোমারে করেন আশীর্বাদ—
তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন
বৃষ্টি ধৌত শ্রাবণের
নির্মল আকাশে।[১]

বিশ্বকবির পূর্ণকৃপালাভ রবি-কবির চরম আকাঙ্ক্ষা।

কবির সঙ্গীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।[২]

স্বয়ম্ভুর মত যথার্থ কবির মর্যাদা লাভ করাই ছিল তাঁর কাম্য। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা-ক্রান্তদর্শিত্ব লাভ করার সাধনা।

লব আমি চরমের কবিত্ব মর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এর লাগি সেধেছিনু তান।[৩]

কবির সার্থক সাধনা। চরমের কবিত্ব মর্যাদা তিনি পেয়েছেন। স্বয়ম্ভু সর্বদর্শী যিনি, তিনিই বিশ্বকবি, সেই কবির সত্তা যাঁর মধ্যে আবির্ভূত—মানবজীবনের তথা বিশ্বজগতের সত্যস্বরূপ যাঁর মালিন্যমুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ চিত্তে উদ্ভাসিত কালের বাধাকে অতিক্রম করে—তিনিই যথার্থ কবি,—সত্যদ্রষ্টা। ভারতীয় সাধনার শাশ্বত সত্য তথা জগৎ ও জীবনের সত্য আর কোন কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এমন ভাবে ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দেশ-কাল-সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র বিশ্ব-মানব তাঁর চিত্তে আসন পেতেছে। সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথের চিত্তাকাশে ভারত-আত্মার চিরন্তন সত্য ভাস্বর সবিতার মতই উজ্জ্বল। প্রাচীন ভারতের ঋষির প্রবুদ্ধ আত্মা ছিল সকল সংকীর্ণতার অতীত। তাঁদের আত্মজ্ঞান সর্বকালের সর্বমানবের। উপনিষদের মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা এবং শিক্ষা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহতী সাধনার উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলেন। উপনিষদের অধ্যাত্ম সংস্কার পিতৃরক্তের সঙ্গে তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। তাঁর মানস-রাজ্য বৈদিক ঋষির দিব্যজ্ঞানের আলোকে ঐশ্বর্যময়। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যেও তাই বৈদিক ঋষির দিব্য-আবির্ভাব। বিজ্ঞান ব্রহ্মের সাধক প্রাচীন ভারতীয় ঋষির নবতর অভ্যুদয় ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ রূপে।

১ শেষ লেখা—১২। ২ রোগশয্যায়—৩৪। ৩ শেষলেখা—১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহর্ষির উত্তরাধিকার।

নব্য বাঙ্গালা তথা নব্য ভারতের পথিকৃৎ যুগন্ধর মনীষী ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টানী সভ্যতার উৎকট মোহ থেকে বাঙ্গালীকে রক্ষা করবার জন্য বরাহ অবতারে বিষ্ণু কর্তৃক নিমজ্জন দশা থেকে বসুন্ধরা রক্ষার ন্যায় অজ্ঞতার অতল গহ্বর থেকে বিস্মৃত-প্রায় বেদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে উদ্ধার ক'রে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চোখ বাঁধানো হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে ক্ষীণ দৃষ্টি বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। রামমোহনই সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালীর মোহগ্রস্ত চক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরলেন অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। প্রচার করলেন উপনিষদের ঋষির দিব্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত চির শাশ্বত, চির-ভাস্বর বাণী। রামমোহন উপনিষদের অনুবাদ করলেন, উপনিষদীয় জ্ঞানের আলোচনা করলেন এবং উপনিষদের একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা ক'রে।

রামমোহনের উত্তর সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মোপলব্ধির সাধনায় এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে এবং প্রসারে আত্ম-বিনিয়োগ করলেন। উপনিষদ তাঁরও ছিল ধ্যানের বস্তু—সাধনার এবং উপলব্ধির বিষয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, "মদীয় আচার্য গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। দিবারাত্র তাঁহার এ যোগের বিচ্ছেদ নাই। জাগরণে, নিদ্রায়, ভ্রমণে, উপবেশনে, ভোজনে এবং কথনে তিনি ব্রহ্মে সমাহিত। তাঁহার সমাধানের ভূমি অকাল, অনাকাশ। সকাল এবং সকাশ ভূমিতে তিনি ব্রহ্মদর্শন করিতেন, সে দর্শনে তরঙ্গ উঠিত। অনন্ত গুণাবলম্বী পরমেশ্বরের অনন্ত কীর্তি উপলব্ধি করিয়া যখন যে ভাব তাঁহার মনে উঠিত, তিনি তখন তাহা গানের দ্বারা শ্রুতির দ্বারা হাফেজের দ্বারা ব্যক্ত করিতেন এবং আমাকে নিকটে ডাকিয়া তাহা শুনাইতেন। তিনি নিশীথ সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয্যাতে বসিয়া আরাধনা করিতেন।............

ভোরে এরূপ স্থানে যাইয়া বাহিরে বসিতেন, সেখান হইতে সূর্যের উদয় নিরীক্ষণ করা যায়। কী প্রকারে উষার শুভ্র আলোক ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিল কি প্রকারে ব্রাহ্ম মুহূর্তে রক্তিমবর্ণ সূর্য পৃথিবীর বৃক্ষ লতা পর্বত ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশে দেখা দিল ইহা দেখিবার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিতেন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে বস্ত্র মুড়ি দিয়া বসিয়া চুপে চুপে সেই প্রাতঃ সূর্য হইতে অমৃত আহরণ করিতেন। বলিতেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

অনন্তর বৈদিক উপাসনা ব্রাহ্মধর্মের প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিতেন। এ সময়ে গায়ত্রী মন্ত্র অনেকবার জপ করিতেন।......

তিনি সতত তাহারই সঙ্গে থাকিতেন যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, শব্দ নাই অথচ বলেন। অথবা তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন বলিয়া কি নিদ্রিত থাকিতেন? না তিনি অত্যন্ত জাগ্রত থাকিতেন। এই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ব্রহ্ম দর্শন করিতেন; সত্যের সিদ্ধান্ত করিতেন।............তিনি শরীরের অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া বিষ্ণুর সেই পরম জ্যোতিষ্মান্ পদে আপনার জ্ঞানেন্ধন প্রদান করিতেন।"[১]

গৃহী তপস্বী মহাযোগী মহর্ষির কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পিতার সাধনার তথা ঔপনিষদিক চেতনার উত্তরাধিকার। মহর্ষি স্বয়ং শিশু-রবিকে উপনিষদ-শিক্ষা দিতেন। বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, "একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।.........

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম।

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট, ৩য় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রটা এমন নহে যে সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।............আমার একদিনের কথা মনে পড়ে,—আমাদের পড়িবার ঘরে শান বাঁধানো মেঝের এক কোনে বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল।"[১]

উপনয়নের পরে গায়ত্রীমন্ত্র জপ কিভাবে কবিচিত্তকে অখণ্ডচৈতন্যের সাযুজ্যে এনে দিত, কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন, "উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল।...............এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'তো বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে। তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত।"[২]

উপনয়নের পরই কবি পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করেন। হিমালয়ে অবস্থান কালেও মহর্ষি পুত্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় থেকেই উপনিষদের মন্ত্রে কবির হাতে-খড়ি হয়। কবি লিখেছেন, "সূর্যোদয়-কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।"[৩]

মহর্ষি নিজের জীবনেই কেবল উপনিষদকে প্রধান অবলম্বন করেছিলেন তা নয়, তাঁর পরিবারেও বৈদিক মন্ত্রকে বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, লিখেছেন, আমাদের বাড়ীতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল, সেটি উল্লেখ-যোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে

১ পিতৃদেব,—জীবনস্মৃতি।
২ মানুষের ধর্ম।
৩ হিমালয় যাত্রা—জীবন স্মৃতি।

পারা যাবে সাধারণতঃ বাঙ্গালাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের উপাসনা ছিল শান্ত, সমাহিত।" [১]

শিশুকবির মানসভূমিতে মহর্ষির নীরব সাধনা এবং তৎ-প্রবর্তিত বৈদিক মন্ত্রের প্রভাব কি পরিমাণে শিকড় চালিয়েছিল তার কতকটা আভাষ পাওয়া যাবে কবির উপরোক্ত উক্তি থেকে। বাল্যকালেই যে বৈদিক মন্ত্রে কবির দীক্ষা হ'লো, সেই মন্ত্রই সারাজীবন কবির কাছে উপাস্য হ'য়ে রইলো। কেবল উপাস্য নয়, বাল্যকাল থেকেই তা কবিচেতনার সর্বস্তরে প্রভাব সঞ্চার করলো। ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত করলেন। কবিও পিতৃদত্ত ভার মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। আশ্বিন থেকে মাঘোৎসব পর্যন্ত কয়েকমাসে রবীন্দ্রনাথ বত্রিশটী ব্রাহ্ম সঙ্গীত এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ রচনা করলেন। এইভাবে বেদ-উপনিষদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবি মানস গঠনে অপ্রতিহত এবং সুগভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে রবীন্দ্র-চিন্তা রাজ্যে চিরস্থায়ী স্বর্ণসিংহাসন দখল করলো।

১—৫, আত্মপরিচয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ঔপনিষদিক চেতনা।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্র মানসে ঔপনিষদিক চেতনা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। ফলে রবীন্দ্রকাব্যেও এই প্রভাবের স্বাক্ষর প্রথম জীবনের কাব্য থেকেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। সন্ধ্যা সঙ্গীতের দুঃখ বেদনা ও হতাশার 'হৃদয়ারণ্য' থেকে পথহারা কবি-চিত্তের 'নিস্ক্রমণ' ঘটলো প্রভাত সঙ্গীতে ঔপনিষদিক জ্ঞানের আনন্দ-জ্যোতিতে পরিস্নাত হ'য়ে। কবিচিত্ত-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'লো। কবির আনন্দোচ্ছ্বাস নির্গত হ'লো:

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
কি জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

কবি-প্রতিভা পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো, বিশ্বকে আপন করার জন্য বন্ধনমুক্ত নির্ঝরের মতই উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।

এখন থেকেই কবি পেলেন আনন্দ লোকের সন্ধান। এই সময়ের কবি-মনের আকস্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছেন, "একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে (ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের গাছের দিকে) চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, এক অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার-সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের সর্বত্র যে একটা বিষাদের ভাব ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়াই বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের তখন ও যবনিকা পড়িল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।"[১]

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে কবিচিত্তের উদ্বোধন। রুদ্ধগতি নির্ঝরিণীর মত কবি-চিত্ত-নির্ঝরিণী প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে গুমড়ে মরছিল; হঠাৎ বৈদিক জ্ঞান ভাণ্ডারের আনন্দ-দ্যুতি রুদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করে পথ খুলে দিল। পরমানন্দে কলগীতি গাইতে গাইতে অসীম সাগরে ছুটে চললো সে। তাই কবি-চিত্ত-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সাথে সাথেই সুরু হোল 'প্রভাত উৎসব'। নিত্যজ্যোতির দিব্যস্পর্শে তামসী রাত্রি অবসিত হওয়ার সাথে সাথেই আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে উঠ্‌লো কবি-চিত্ত।

হৃদয় আজিকে কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
প্রভাত হল যেই কী জানি হল একী
আকাশ পানে চাই কী জানি কারে দেখি॥

* * *

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।[২]

১ — জীবনস্মৃতি।

২ প্রভাত উৎসব, প্রভাত সঙ্গীত।

অন্যত্র কবিকৃত উক্তি ও এই সময়ে কবিচিত্তে উপনিষৎ-চেতনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। "এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বারা খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্য জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান্ বিরাট সমুদ্রের দিকে। একেই এখন বল্‌ছি বিরাট পুরুষ।.........

সে দিন যে দুজন মুটের কথা বলেছি, তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে সখ্যের আনন্দ অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন চিত্তের গভীরে।......

......যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানব-সম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেই দিন।......

এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে, তা দেখিনি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল।............

তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতে তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে।......

সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই।......

......স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।"[১]

প্রভাত সঙ্গীতের যুগেই উপনিষদের আনন্দ লোকের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন। এই আনন্দানুভূতি কবির পরবর্তী সমস্ত জীবনে অক্ষুণ্ণ ছিল। কবির সমগ্র চিন্তায় এবং বিশাল কাব্যসৃষ্টিতে ঋষির অমৃতমন্ত্র স্থায়ী প্রভাব সঞ্চার ক'রে চললো এখন থেকে। এই সময়ের রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, "কবি আহ্লাদিত হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সূর্যোদয়ের আনন্দ-স্পর্শে, অথবা বলা যায়, তিনি যাত্রা করেছিলেন স্থূল

১ মানুষের ধর্ম।

পৃথিবীর পথে, কিন্তু মানস-প্রয়াসের সাহায্যে বহু শত শতাব্দী অতিক্রম ক'রে উপনীত হলেন উপনিষদের ভাব-রাজ্যে। প্রকান্তরে এও বলা যায় তিনি অনুভব করেছেন বাস্তব পৃথিবীকেই, কিন্তু উপনিষদের ভাব-তীর্থে অবগাহন করে।" ১

উপনিষদের আনন্দলোক কবির জীবনে যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এর জন্যে মানস-প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল না। উপনিষদের আলোকতীর্থে স্নান করে কবির যে যাত্রা সুরু হোল 'প্রভাত সঙ্গীত' থেকে সে যাত্রায় বৈদিক প্রভাব কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও বা অস্পষ্টভাবে মিশে রইলো রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায়। সোনার-তরী-চিত্রা-চৈতালীর সৌন্দর্য সম্ভোগের যুগেও এই প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'কল্পনা'র বৃহত্তর জীবনের আকুলতাতেও এই প্রভাব। নৈবেদ্যে উপনিষদীয় ভাবরাজ্যেই কবির বিচরণ। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে বৈষ্ণবীয় ভক্তির সঙ্গে উপনিষদের আত্মজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। বলাকার গতিতত্ত্বেও বৈদিক ঋষির অনুসরণ সুস্পষ্ট। শেষ জীবনের কাব্যগুলি বৈদিক মন্ত্রের মতই ঋজু এবং সংহতরূপ ধারণ করেছে। এই যুগের কাব্যে বিশেষতঃ শেষ চারিখানি কাব্যগ্রন্থে বৈদিক ঋষির কণ্ঠই শুনতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। মনে হয় অতীত ভারতের ঋষি অবতীর্ণ হয়েছেন বঙ্গভূমিতে যুগযুগান্তের সাধনালব্ধ মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে।

১ রবীন্দ্রমানস সম্পর্কে কয়েকটি কথা—রবীন্দ্র মানস।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকৃতি চিন্তা

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ প্রকৃতির কবি। কবির প্রকৃতি প্রেম অসীম, অফুরন্ত। বাল্যকাল থেকেই তিনি ভাল বেসেছেন প্রকৃতিকে। জীবন স্মৃতিতে কবি লিখেছেন, "আমার শিশুকালেই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত।............

সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মত ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত, তাহা সম্ভব অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত।"১

শৈশবে জাত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ঔপনিষদিক জ্ঞান-প্রভাবিত নিজস্ব জীবন দর্শনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এমনই এক গাঢ় প্রকৃতি-তন্ময়তা এনে দিয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে, যায় তুলনা অন্য কোন কবির কাব্যে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রীতির উপরে কালিদাস, ভবভূতি, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, শেলী, কীট্স্, বিহারীলাল প্রভৃতি বিভিন্ন কবির প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিকট স্বীয় ঋণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কবি (বিহারীলাল) যখন গাহিলেন 'সর্বদাই হু হু করে মন' তখন বালকের অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল। কবি যখন বলিলেন,—

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ
যাই কোন এ হেন প্রদেশ

১ প্রভাত সঙ্গীত—জীবনস্মৃতি।

যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন অবশেষ।

*   *   *

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে
ক্ষীণ প্রাণী ত্রাসে মরে
যাথায় শ্বাপদ দল
করে ঘোর কোলাহল
ঝিল্লি সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।
তথা তার মাঝে বাস করি
ঘুমাইব বিভাবরী—
আর কারে করি ভয়
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়
মানুষ জন্তুকে যত ডরি।

তখন এই চিত্রে ভয়ের উদয় না হইয়া বাসনার উদ্রেক হইল। যে ছেলে ঘরে বাহিরে একটি দিন যাপন করিতে কাতর হয়, ঝিল্লিরবাকুল বিষাদবায়ু বীজি ঘন-অরণ্যবেষ্টিত ভীষণ ভগ্নাবশেষ কেন যে তাহার নিকটে বিশেষরূপে প্রার্থনীয় বোধ হইল বলা কঠিন।................এই বর্ণনাগুলি কতবার পা করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, এবং এই সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া সমুদ্র, পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।" ১

এই প্রবন্ধে আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কবি যে মন হু করার কথা লিখিয়াছেন, তাহা কি প্রকৃতির বলিতে পারি না। কিন্তু এ বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক পাঠকের মন হু হু করিয় উঠিত।" ২

দেশী বিদেশী অনেক কবির ঋণ-স্বীকার করে নিয়েও একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার যে অপূর্ব অনুভূতি, তা সকল পূর্বসূরী

১ বিহারীলাল—আধুনিক সাহি

ভাবনা ও অনুভূতিকে অতিক্রম ক'রে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাল্য-কালে লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'কবিকাহিনী'তেই কবির প্রকৃতি প্রীতি সুস্পষ্ট। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবি কাহিনী'তেই নায়কের বেনামীতে নিজের প্রকৃতি-প্রীতির কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। কবি কাহিনীর নায়ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

'মানসী' তে কবির প্রকৃতি-চিন্তা বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্ব-সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ক'রে কবি সীমার মাঝে অসীমের প্রতিকৃতি খুঁজে পাচ্ছেন।

এ চিরজীবন তাই, আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।

অসীমকে সীমার দ্বারা বিধৃত করাই কবির লক্ষ্য। 'সোনার তরী' থেকে এই চিন্তা আরও গভীর হ'য়ে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে,—কোন কোন কবিতায় আবার একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে ও আত্মপ্রকাশ করেছে। 'সোনার তরী' থেকেই কবি নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন বোধ করছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি কাব্যের একটা পটভূমি বা অবলম্বন মাত্র নয়,—প্রকৃতি জড় ও নয়—প্রকৃতি কেবলমাত্র মানব জীবনের উপরে প্রভাব সঞ্চারীও নয়,—কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি চেতনাময়ী, বিশ্ব বসুন্ধরার অণু পরমাণু চৈতন্যময়, বিশ্ব-বসুন্ধরার তথা বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র চলেছে অখণ্ড প্রাণ-প্রবাহ। সেই প্রাণ-প্রবাহেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ তৃণ-লতা-তরু-গুল্ম-মনুষ্য-মনুষ্যেতর জীব। কবি-আত্মাও সেই প্রাণ-প্রবাহেরই অংশ। প্রকৃতির চেতনায় আর কবির চেতনায় কোথাও কোন পার্থক্য নেই। কবির আত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে কবি চৈতন্যের এই একাত্মতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সোনারতরীর বসুন্ধরা কবিতা।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফল ফুলগন্ধ রেণু। তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব-অঙ্গে সর্বমনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহনিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুম মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতা তৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোন দিন শরৎ কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণ ক্ষেত্র পরে
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব নিচয়ে
আকাশের নীলিমায়।

সমকালের লেখা ছিন্নপত্রে কবি লিখেছেন, "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য-কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোম-কূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ-ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, যখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহে পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে।"[১]

আর একটি পত্রে কবি লিখেছেন, "বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নীচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র শক্তি অবিশ্রাম চলচে, খানিকটা কাঁপচে, খানিকটা টলচে, খানিকটা ফুলচে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়চে। ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করছি।"[২]

সোনারতরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতা যুগ যুগান্তরের, লক্ষকোটি বর্ষের—এমন কি পৃথিবী যখন ভ্রূণ অবস্থায়, তখনও।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হবার আগেই অখণ্ড বিশ্ব-চৈতন্যের বোধ কবির মনে জেগে উঠেছিল।

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে ;
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ চাহে সখী করিতে প্লাবিত।[৩]

১ ছিন্নপত্র, ২০শে আগষ্ট, ১৮৯২, শিলাইদহ।
২ ঐ ১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪, ঐ ।

কিশোর কবি অনুভব করেছিলেন, বিশ্বপ্রাণ-প্রবাহের অংশ বিশেষ তাঁর ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ। বিশাল প্রাণ-শক্তি দেহ-পিঞ্জর ভেদ ক'রে বিশ্বব্যাপী হ'তে চায়। কৈশোরের এই অনুভূতি 'সোনার তরী' ও পরবর্তী কাব্যে দৃঢ়মূল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগান্তরব্যাপী সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ির স্পন্দন কবি নিজের নাড়িতে অনুভব করেছেন।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়িতে আজ করিছে নর্তন।[১]

একই প্রাণ-প্রবাহের অংশ হওয়ায় প্রকৃতি আর কবি-জীবন এক হয়ে ওঠে।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক সভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে
আছি হিমাদ্রির সাথে
আছি সপ্তর্ষির সাথে
আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা।[২]

১ নৈবেদ্য—২৬। ২ বিস্ময়, পরিশেষ।

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায় তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইলো ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগন পারের আমার ঘরের রুদ্ধদ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়
আজ হয়েছে খোলাখুলি তাদের সাথে কোলাকুলি
মাঠের ধারে পঞ্চতরুর ছায়।[১]

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে!
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণজলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।[২]

এই ধরণের উদ্ধৃতি রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে প্রচুর সংগ্রহ করা যায়। প্রকৃতির মত স্বদেশের মাটীও কবির দেহে মনে প্রাণে মিশে গেছে।

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্তি
মর্মে গাঁথা।[৩]

১ মাটির ডাক—পূরবী।

২ উৎসর্গ—১৪।

৩ স্বদেশ—২।

প্রকৃতিকে গাছ পাথর মাটী বলে মনে না করে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক অনন্ত অখণ্ড বিশ্বপ্রাণেরই অভিপ্রকাশ রূপে। তাই নিজের সঙ্গে প্রকৃতির অভিন্নতা উপলব্ধি ক'রে কবি বারংবার শুনেছেন প্রকৃতির আহ্বান। তিনি লিখ্ছেন, "এই যে অচিন্ত্যনীয় শক্তি, এই যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই যে অপরিসীম সত্য, এই যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম, তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে, নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগ যুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে। শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলি আরো আরো আরো ; তবু সেই এক, কেবলি এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক। সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক—কিন্তু কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত।"[১]

তাই রবীন্দ্রনাথ ধরার ধূলিতে 'সত্যের আনন্দরূপ' প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনও তিনি অনুভব করেছেন যে প্রকৃতির রূপরসগন্ধ তাঁর দেহমন গঠনের ও উপাদান রূপে কাজ করেছে।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদ ধান্যে যে আভা বাতাসে নাচে
কিরণে কিরণে হাসিত হিরণে হরিতে,
সে গন্ধই গড়েছে আমার কায়া
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।[২]

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব অনুভব, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি—জড়ে

১ পথের সঞ্চয়।
২ উৎসর্গ—২১।

জীবে সর্বত্র নিজের অস্তিত্বের অনুধ্যান,—ভারতীয় চিন্তাধারার অনুস্যূতি। ঋষি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। উপনিষদের আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ব্যপদেশে উপনিষদে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে চারিটি বিষয় প্রধান উল্লেখযোগ্য। প্রথম, আত্মার বিশ্বব্যাপকতা, দ্বিতীয় আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ, তৃতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব, চতুর্থ লয় রহস্য.........উপনিষদের মত এই,—পরমাত্মা সর্বভূতে সমভাবে বিরাজমান আছেন; ইহ সংসারে সকল পদার্থেই তিনি ওতঃপ্রোত অবস্থিতি করিতেছেন। অধুনা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা একেশ্বর বলিতে যে ভাব সচরাচর উপলব্ধি হয় সে হিসাবে উপনিষদের পরব্রহ্মের আদর্শ স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে 'একেশ্বর' শব্দে 'একমাত্র ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং এই বিশ্বসংসার তাঁর সৃষ্ট সামগ্রী' এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু উপনিষদের অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উপনিষদের মতে,—জগদীশ্বর এক বটেন, পরব্রহ্ম এক বটেন; কিন্তু সৃষ্ট সামগ্রী তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; অর্থাৎ পরমাত্মা অভিন্ন ভাবে বিশ্বসংসারে মিশিয়া রহিয়াছেন,—এ বিশ্ব তাঁহারই প্রতিকৃতি মাত্র।"[১]

বেদ-উপনিষদের ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মা এক অভিন্ন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। অপর দিকে সৃষ্টির মধ্যেই তিনি বিরাজ করছেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক অভিন্ন,—অদ্বয়। কঠোপনিষৎ বলেছেন, "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।" —"সেই পরম প্রাণ থেকে নির্গত হ'য়ে যা কিছু প্রাণময় সবই কাঁপছে।" প্রাণময় সেই পরম পুরুষই সর্বস্রষ্টা।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥[২]

"এই পুরুষ হইতেই প্রাণ জাত হয় এবং মন সর্বেন্দ্রিয় আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূতা হয়।"[৩]

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।

---

১ পৃথিবীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

২ মণ্ডুকোপনিষৎ ২।১।৩।

৩ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

অতশ্চ সর্বে ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥[১]

এই পুরুষ থেকে জন্মায় সমুদ্র ও পর্বত, প্রবাহিত হয় নদী, সৃষ্ট হয় ওষধি এবং রস, ইনি অন্তরাত্মা রূপে সর্বভূত পরিবেষ্টিত করে আছেন।

ঋগ্বেদেও অনুরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ বলছেন, এই পরম পুরুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥[২]

স্রষ্টা যিনি—তিনিই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত। এক ছাড়া দুই নেই। বিরাট পুরুষ পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে আছেন।

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥[৩]

"যাহার মস্তক দ্যুলোক, চক্ষু চন্দ্র ও সূর্য, কর্ণ দিকসমূহ বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং যাঁহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা॥"[৪]

সর্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥[৫]

"সকল প্রাণীর হস্ত ও পদ সেই ব্রহ্মেরই; সর্বজীবের চক্ষু, মস্তক ও মুখ তাঁহারই এবং সকল প্রাণীর কর্ণও তাঁহারই; তিনি প্রাণীর দেহে প্রত্যগাত্মা-রূপে অবস্থান পূর্বক সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন।"[৬]

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ।"[৭]

---

১ মণ্ডুক ২।১।৯॥ ২ ঋক্ ১০।৯০।১৩—১৪। ৩ মণ্ডুক ২।১।৪ ৪ অনুবাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ। ৫ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৩।১৬। ৬ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৭ ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫।১৮।২

"এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজাই (দ্যুলোক) মস্তক, বিশ্বরূপ আদিত্য চক্ষুস্বরূপ, পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা (বায়ু) প্রাণস্বরূপ, বহুল (আকাশ) দেহমধ্যভাগ, জল নিশ্চয়ই বস্তিস্বরূপ, পৃথিবীই পাদদ্বয়, বেদি বক্ষঃস্থল, বর্হি বা কুশই লোমসমূহ, গার্হপত্য অগ্নি হৃদয়স্বরূপ, অন্বাহার্যপচনই (দক্ষিণাগ্নি) মনঃস্বরূপ এবং আহবনীয় অগ্নি মুখবিবরস্বরূপ।"[১]

অথর্ববেদ ঘোষণা করেছেন, "পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশ্বরো যদন্যেনাভবৎ সহ।"—অতীত এবং বর্তমান সবই সেই পুরুষ। তিনি অমৃতত্বের (দেবতাদের) ঈশ্বর এবং অন্নাদির দ্বারা জীবিত থাকেন যাঁরা, তাঁদের সকলের সঙ্গেও থাকেন।

এই নিরাকার বিরাট পুরুষ ব্রহ্ম বিশ্বের সর্বত্র; বিশ্ব-বসুন্ধরার সর্বত্র তাঁর অস্তিত্ব লীন হয়ে আছে। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে পৃথক কল্পনা করা যায় না। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল সৃষ্টিতেই তিনি বিদ্যমান।

"অশরীরং শরীরেষনবস্থেষ্ববস্থিতম্।"[২]

—তিনি অশরীরী হয়েও অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥[৩]

সেই পরমাত্মাই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই দীপ্তিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই জল এবং তিনিই বিরাট। তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার এবং কুমারী, তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ড সহায় স্খলিত পদে চল এবং তুমিই জাত হইয়া নানারূপ ধারণ কর। তুমি নীল পতঙ্গ (অর্থাৎ ভ্রমর), তুমি হরিদ্বর্ণ ও রক্তচক্ষু শুকাদিপক্ষী তুমি আদি বিহীন, তুমি সর্বব্যাপকরূপে বর্তমান আছ,—তোমা হইতে বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।"[৪]

---

১ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। ২ কঠোপনিষৎ। ৩ শ্বেতাশ্বতর ৪।২—৪। ৪ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য পর্জন্যো মঘবান্ বায়ুঃ
এষ পৃথিবী রয়ির্দেব সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥১

ইনি অগ্নিরূপে প্রজ্জলিত হন, ইনি সূর্য (রূপে প্রকাশ করেন), ইন্দ্র (রূপে প্রজাপালন ও অসুরদিগকে সংহার করেন), বায়ু (রূপে সকলকে ধারণ করেন) চন্দ্রমা (রূপে পোষণ করেন) ; ইনি মূর্ত ও অমূর্ত ; যাহা কিছু অমৃত তাহাও ইনি ।[২]

এষ ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতিঃ এতে সর্বে দেবাঃ ইমানি চ পঞ্চ-মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীত্যেতানি ইমানি চ ক্ষুদ্র-মিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি, চেতরাণি চ অণ্ডজানি জরায়ুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি-তৎপ্রজ্ঞা-নেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম । [৩]

—ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই সকল পঞ্চমহাভূত যথা পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ও তেজঃ এবং অপর জীবগণের উৎপাদক ক্ষুদ্র-প্রাণিগণের সহিত সর্পাদিও ইনি, অপিচ সবল ও সচল সমস্তই অর্থাৎ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ জীব এবং অশ্ব গো মনুষ্য ও হস্তিসমূহ এবং আর যে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে অথবা যাহারা অচল (এই সমস্তই ইনি)। প্রজ্ঞানই তৎ সমুদয়কে সত্তাযুক্ত করেন, প্রজ্ঞানেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রবৃত্তির নিয়ামক এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয় ; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম । [৪]

জড়ে জীবে সর্বত্র সর্বরূপে তিনি। আত্মার অস্তিত্ব সর্বত্রই সমভাবে বর্তমান। আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব সম্পর্কে শ্রুতি আরও বলেছেন,

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোম সদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ [৫]

১ প্রশ্নোপনিষৎ ২।৫
২ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ ।
৩ ঐতেরেয়োপনিষৎ ৩।১।৩
৪ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ ।
৫ ঋগ্বেদ—৪।৪০।৫, কঠ ২।২।২ ।

—হংস অর্থাৎ আত্মা (সূর্য) স্বর্গরূপ শুচিপ্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'শুচিষৎ', সর্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া বসু ; বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ' ; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিম্বা শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া 'হোতা' ; পৃথিবীরূপ বেদীতে বাস করেন বলিয়া বেদিষৎ ; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরূপে দুরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ' ; নৃতে (মনুষ্যে) অবস্থান করায় 'নৃষৎ' ; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া 'বরসৎ' ; শঙ্খ ও মৎস্যাদিরূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া 'অব জা' ; গোরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া 'গোজা' ; ঋত অর্থাৎ (অবশ্যাবশ্যী কর্মফল) তাহাতে প্রকটিত হয় বলিয়া 'ঋতজা' এবং পর্বতে প্রকাশ পান বলিয়া 'অদ্রিজা' ; তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ এবং মহৎ। [১]

এক কথায় শ্রুতি প্রতিপাদ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম দৃশ্য অদৃশ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ-জড়-চেতন সকল পদার্থেই বর্তমান সমভাবে। অথবা তিনিই নানাভাবে বিশ্বচরাচরে নিজেকে প্রকটিত করেছেন। তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণশ্চ ॥ [২]

অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সর্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ; তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, চেতয়িতা নিরুপাধিক ও নির্গুণ। [৩]

উপনিষদ্ সব কিছুকেই আত্মা বলেছেন,

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ
অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি আপ
ওষধয়ঃ বনস্পতয় আকাশ আত্মা। [৪]

১ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

২ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।১১

৩ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

৪ শিক্ষোপনিষৎ—১৩।

সেই সর্বব্যাপী মহান্ ব্রহ্মকে শ্রুতি প্রণতি জানিয়েছেন :

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ ১

ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতিতে পরমাত্মার অস্তিত্ব এবং প্রকাশ সত্য হয়ে ত উঠেছেই, এমন কি বৃক্ষলতাকেও তাঁরা ঈশ্বর জ্ঞান করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন :

যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২

—ফলবতী, ফলহীনা,পুষ্পহীনা, সপুষ্পা ওষধিসমূহ বৃহস্পতি কর্তৃক অনুজ্ঞাত (সৃষ্ট) হ'য়ে আমাদের পাপমুক্ত করুক।

ওষধিতে বনস্পতিতে বিশ্বচরাচরে যাঁর অবস্থান তিনিই বিরাট পুরুষ— তিনিই ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষ পুরুষ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ৩

সেই পুরুষ সহস্রমস্তকবিশিষ্ট, সহস্রচক্ষু এবং সহস্র পদ বিশিষ্ট, অথচ দশ-অঙ্গুলি পরিচিত হ'য়েও সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত ক'রে আছেন।

ঋগ্বেদের অন্য একটি সূক্তেও এই বিরাট পুরুষের মহত্ত্ব কীর্তন করা হয়েছে।

বিশ্বতো চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥৪

—তাঁর সর্বব্যাপী চক্ষু, সর্বব্যাপী মুখ, সর্বব্যাপী বাহু, সর্বব্যাপী পদ। তিনি বাহুদ্বারা স্বর্গকে সম্যকরূপে প্রেরণ করে পদের দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করে এক অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ করছেন।

উপনিষদেও এই বিরাট পুরুষের স্তুতি। উক্ত মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেও আছে।[৫] উপনিষদে আরও বলা হয়েছে :

সর্বত : পানিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্বত : শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৬

---

১ শ্বেতাশ্বতর ২।১৭ ২ ঋগ্বেদ ১০।৯৭।১৫। ৩ ঋগ্বেদ ১০।৯০।১
৪ ঋগ্বেদ ১০।৮১।৩ ৫ শ্বেতাশ্বতর ৩।৩। ৬ শ্বেতাশ্বতর—৩।১৬

সকল প্রাণীর হস্ত ও পদ সেই ব্রহ্মেরই, সর্বভূতের চক্ষু, মস্তক ও মুখ তাঁহারই, এবং সকল প্রাণীর কর্ম ও তাঁহারই; তিনি প্রাণীদেহে প্রত্যগাত্মারূপে অবস্থান পূর্বক সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন।

বিরাট পুরুষ পরম প্রাণ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন করে সৃষ্টি হচ্ছে তা একটি উপমা সাহায্যে শ্রুতি ব্যক্ত করেছেন সুন্দরভাবে: স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব সেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি, তস্যোপনিষৎ-সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।[২]

—যেমন ঊর্ণনাভি একাকী অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে ও স্বশরীর থেকে সূত্র বহিষ্কৃত করে, অথবা যেমন জলন্ত অগ্নিপিণ্ড থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নানারূপে নির্গত হয়, তেমনি আত্মা থেকে সকল লোক, সকল দেব, সকল জীব বিনির্গত হয়েছে। ইহাই উপনিষৎ-সত্যের সার। এই প্রাণ সত্য। আত্মা সেই সত্যেরও সত্য (অর্থাৎ আত্মার সত্তা বলেই প্রাণের সত্তা)।

উপনিষদ বলেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বজগতে ভিন্নভিন্নরূপে বর্তমান আত্মা এক অদ্বয়। অজ্ঞান ব্যক্তি দ্বৈত কল্পনা ক'রে থাকেন। আত্মজ্ঞান লাভ হ'লেই দ্বৈতবোধ বিলুপ্ত হয়। তখন সবই একাকার। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।"[৩]

—যেখানে দ্বৈতভাব জন্মায় সেখানে একে অন্যকে দেখে, একে অপর বস্তু শোনে একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপর বস্তু চিন্তা করে, একে অপর বস্তুর জ্ঞান করে। যখন উপাসকের আত্মার সর্বময়ত্ব জ্ঞান জন্মায় তখন কে কাকে দেখে, কার দ্বারা কি শোনে, কে কাকে অভিবাদন করে, কে কাকে

১ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

২ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ— ২ অ ১ ব্রাঃ।

৩ ঐ — ২ অ. ৪ ব্রাঃ

চিন্তা করে কে কাকে জানে? যাঁর দ্বারা সবই জ্ঞাত হয়েছে, তাঁকে কে জানে? বিজ্ঞাতাকে কে জানতে পারে?

আত্মার সর্বগতত্ব সর্বময়ত্ব জ্ঞান জন্মালে দ্বৈতভাব লোপের ফলে আত্ম-পর ভেদ জ্ঞান থাকে না। এখন প্রশ্ন এই যে আত্মা যখন একই তখন তাঁর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন কেন? কেন আত্মা কোথাও জড়রূপে, কোথাও বৃক্ষলতাদি-রূপে, কোথাও মনুষ্যরূপে, কোথাও বা মনুষ্যেতর জীবরূপে প্রকাশিত হন? তার উত্তরে শ্রুতি বলছেন :

অগ্নির্যথৈকো ভুবনে প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।[১]

—একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে তেমনি একই আত্মা সর্বভূতের অন্তরে ও বাইরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনে প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥[২]

—এই বায়ু যেমন জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন।[৩]

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥[৪]

---

১ কঠ, ২।১।
২ ঐ, ২।১০
৩ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। ৪ কঠ—২ ১২

—বশী (সর্বনিয়ন্তা) ও সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্যক ও মনুষ্যভেদে বহু প্রকার করিয়া থাকেন। নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখলাভ হয়, অপরের হয় না।[১]

আত্মা নিরাকার অব্যয়, তাঁর কোন বিশেষ আকৃতি ত নেই। জল যেমন আধার অনুসারে আকার পায়, একই অগ্নি যেমন আধার অথবা দাহ্যবস্তুর অনুরূপ রূপ লাভ করে, বায়ু যেমন বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভাবেই ত আত্মার ভিন্ন আধারে ভিন্ন রূপ। আসলে বায়ু, অগ্নি এবং জলের মত তিনি অবিকৃত। এই সত্যই উপনিষদের সত্য। এই সত্য উপলব্ধি হ'লে সর্বপদার্থেই আত্মদর্শন ঘটবে ; তখন দৃষ্টি হবে স্বচ্ছ তখন এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, নিজের সঙ্গে সকল বিকারজাত পদার্থের কোন পার্থক্য অনুভূত হবে না। এই অনুভব যাঁর জন্মেছে তিনিই জ্ঞানী—আত্মতত্ত্বজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা—ঋষি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন :

যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥[২]

যিনি সর্বভূতে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেই সর্বাত্মভাব দর্শনের ফলে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না।[৩]

অন্যত্র আছে : সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥[৪]

কেনোপনিষৎ ও অহংকার বা আমিত্ব (আত্মবুদ্ধি) ত্যাগ করে সর্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে জেনে অমৃত লাভ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রঃ মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥[৫]

১ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। ২ ঈশ—৬
৩ ঐ ঐ ৪ কৈবল্যোপনিষৎ—১।১০
৫ কেন ১।২

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যেরও বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ ; এই হেতু পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি (অহং) ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ অমর হন।[১]

আত্মার অস্তিত্ব যে সর্বভূতে সর্বত্র একথা শ্রুতি বারংবার ঘোষণা করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন, "অয়মাত্মা সর্বানুভূঃ।"—এই আত্মা সর্বত্রই অনুভূত হন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ তাঁকে কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতুরূপে বর্ণনা করেন নি ; বলেছেন, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি লয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যদ্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"

—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মিতেছে, যাঁহা হইতে জাত জীব জীবিত থাকিতেছে—আবার প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়,—লয়প্রাপ্ত হয়,—তুমি তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর। তিনিই ব্রহ্ম।[২]

আত্মা সর্বত্রই বিরাজিত, অথচ সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না—তাঁকে অনুভবও করতে পারে না। কিন্তু তিনি আছেন এই দৃশ্যমান জগৎ চরাচরে এই ব্যাপারটিকে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন ছান্দোগ্য উপনিষৎ। পুত্র শ্বেতকেতুকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রসঙ্গে আত্মদর্শী পিতা কিছু পরিমাণ লবণ এনে একপাত্র জলে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। জলে লবণ দ্রবীভূত হ'লে ঐ পাত্রস্থ জল বিভিন্ন স্থান থেকে একটু একটু তুলে নিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। দ্রবীভূত লবণ জলের সর্বত্রই অবস্থিত। "তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি।"[৩] —(পিতা) শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সোম্য, এই জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত লবণ যেমন দর্শন করিতেছ না, তেমনি তেজঃ জল ও পৃথিবীর পরিণতি-স্বরূপ এই দেহমধ্যে অবস্থিত সৎবস্তুকেও দর্শন করিতে পারিতেছ না ; বস্তুতঃ তাহা ইহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে।[৪]

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রদত্ত অপর দৃষ্টান্তটি নদীর। কলনাদিনী স্রোতস্বিনী পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর নানাদিক থেকে দুর্গমগিরি দুস্তর কান্তার অতিক্রম করে

১ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ২ ঐ ঐ
৩ ছান্দোগ্য ৬ অঃ, ১৩ খঃ ২ (৫০৪) ৪ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

মহুয়া প্রভৃতি নাম বহন ক'রে শেষে মিলিত হয় মহাসাগরে। মহাসাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে মিলিত হওয়ার পরে স্তব্ধ হয় তাদের কলনিনাদ, বিলুপ্ত হয় সকলের পৃথক্ অস্তিত্ব। কে পূর্ব-বাহিনী, কে পশ্চিম-বাহিনী—কি ছিল তাদের পরিচয়,—তা আর চেনা যায় না। অথচ এই সকল নদী সাগর জলে অবশ্যই বিরাজ করে। পিতা শ্বেতকেতুকে বললেন, "এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি।" ১

—হে সোম্য ঠিক উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় (পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমগামী নদীসমূহ সমুদ্রে মিলিত হয়ে পৃথক অস্তিত্ব মহাসঙ্গমে বিসর্জন দেওয়ার ন্যায়) এই সমস্ত প্রজা সৎ ব্রহ্ম হইতে আসিয়া জানিতে পারে না যে আমরা সৎ ব্রহ্ম হইতে আসিতেছি বা আসিয়াছি। ২

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ আত্মার সর্বব্যাপিত্বকে ঘৃতের উপরিভাগেরর সরের সঙ্গে উপমিত করেছেন।

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৩

—ঘৃতের উপরিভাগের সরের ন্যায় আনন্দপ্রদ ও অতি সূক্ষ্ম সর্বভূতের অন্তর্যামীরূপে নিগূঢ় মঙ্গলময়কে জানিলে সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। ৪

উপনিষদেরব্রহ্মতত্ত্ব এক অপূর্ব বস্তু। এখানে জড়ে জীবে মনুষ্যে উদ্ভিদে কোন ভেদ নেই। যা আমি তাই তুমি, তাই সর্ব চেতন অচেতন পদার্থ। সেই সৎচিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মা সকলের মধ্যেই জাগ্রত রয়েছেন। পার্থক্য বাইরের আকৃতিতে মাত্র। সুতরাং আমি আর সকলের থেকে পৃথক— এ ধারণা ভ্রান্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন, "স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো।" ৫

—সেই সত্ত্ব এই, এ সমস্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতো, সেই সত্য বা সত্যস্বরূপ আত্মা তুমি। ৬

---

১ ছান্দোগ্য ৬ অঃ, ১০ খঃ ২ (৪১৫) ২ অনুবাদ—দুর্গাচরণ
৩ শ্বেতা—৪।১৬২ ৪ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ ৫ ছান্দোগ্য ৬ অঃ, ৮ খঃ ৭ (৪৮৯)
৬ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

ছান্দোগ্য উপনিষদেই অন্যত্র বলা হইয়াছে, "য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মি ॥ [১]

—সূর্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হচ্ছেন—আমিই তিনি,—তিনিই আমি।

"য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মীতি"। [২]

চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হচ্ছেন—আমিই তিনি,—তিনিই আমি।

"য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মি।" [৩]

—এই যে বিদ্যুতে পুরুষ দেখা যায়, আমি তিনি, তিনিই আমি।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই বৈদিক ঋষি প্রত্যক্ষ করেছেন বিরাট অথচ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত আত্মারূপী পুরুষ। সেই পুরুষ মানুষের অভ্যন্তরস্থ পুরুষই ;— অপর কেহ নন। তাই চন্দ্র-সূর্য-বিদ্যুৎ আর জীবের আত্মায় ভেদ নেই। আত্ম-সাক্ষাৎকৃত পুরুষ এই সত্য দর্শন করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ খণ্ডে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মস্বরূপত্ব ঘোষিত হয়েছে। উপনিষৎ সত্যের সার এই কয়টি কথার মধ্যেই পরিস্ফুট।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

—যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জাত ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত এবং ব্রহ্মদ্বারা জীবিত এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব শান্ত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।[৪]

মাণ্ডুক্যোপনিষদেও এই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করা হয়েছে: "সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" [৫]

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ
যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। [৬]

—ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ ; ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উপাদান কারণ, অতএব ইনি ভূতবর্গের উৎপত্তি এবং বিলয়স্থান। [৭]

"নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।"—এই সিদ্ধান্তই উপনিষদের সার কথা এবং শেষ কথা। যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকাশ দিকে দিকে জলে স্থলে নক্ষত্রে গ্রহে উপগ্রহে, তুমি আমি সেই এক—এই অনুভবই উপনিষদের শিক্ষা। এই

১ ছাঃ ৪ অঃ ১১ খঃ ১ ২ ঐ ঐ ১২ খঃ ১ ৩ ঐ ঐ ১৩ খঃ
৪ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
৫ মাণ্ডুক্য—২।
৬ ঐ —৬। ৭ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ

অনুভূতি বা সত্যদৃষ্টি লাভ করার জন্যই ঋষির তপস্যা। এবং এই সাধনায় অর্থাৎ জড় জীব প্রকৃতি ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে স্বীয় আত্মার অভিন্নতাবোধের সাধনায় সিদ্ধিলাভই মুক্তি। ভারতবর্ষ এই অনুভূতি লাভকেই বলেছেন অমৃত লাভ।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সবিস্তারে আলোচনা করা হ'লো। কারণ এ থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনোভূমির পরিচয় পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম বিশ্বপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, মানব-প্রীতি,—সবেরই উৎস নিরূপণ করতে সাহায্য করবে উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্ব। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে রবীন্দ্রচিত্তের বহুধা বিকাশের মূলে রসসিঞ্চন করেছে বৈদিক ঋষিদের তপস্যালব্ধ জ্ঞান। উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত হয় নি,—কবির জীবনে অনন্ত বিশ্বাসরূপে কাজ করেছে,—গভীর বিশ্বাস প্রগাঢ় অনুভূতির রূপ নিয়েছে। কবির 'বিশ্ববোধ' বা 'বিশ্বমানবতা' চিন্তার উৎস বেদ-উপনিষদের আত্মজ্ঞান। এই আত্মানুভূতি কবি লাভ করেছিলেন পিতার তপস্যা এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উত্তরাধিকারীরূপে।

সর্বেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল উপনিষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ চিন্তা যুগ যুগ ধরে ভারতের চিত্তভূমিকে উর্বর করেছে। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাল পর্যন্ত এই 'একত্ব'-চিন্তা প্রসারিত। এক অখণ্ড শক্তির প্রকাশের দ্বারা বিশ্ব-চরাচরের একত্ববিশ্বাসই ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনা। বহু ধর্মসম্প্রদায়, বহু মত, বহু দর্শন থাকা সত্বেও এই একত্বচিন্তা থেকে ভারতবর্ষ কখনও বিচ্যুত হয় নি। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই ঘোষণাই শুনতে পাই :—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রনশ্যামি স চ ন মে প্রণশ্যতি॥[১]

সর্বত্র সমদর্শী যোগী সকল জীবের মধ্যে আমাকে আর আত্মার মধ্যে সকল জীবকে দেখে থাকেন।

---

১ গীতা—৬।২৯—৩০

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সকলকে আমার মধ্যে দেখেন, তিনি আমার কাছ থেকে দূরে থাকেন না,—আমিও তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকি না।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগ বিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভিঃগুণময়ৈর্ভাবৈ রেভি সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥[১]

—হে পার্থ আমাকেই সকল প্রাণীর মূল (বীজ) এবং নিত্যকরণ (সনাতন) ব'লে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীর তেজ॥ হে ভরতর্ষভ, আমি কামরাগবিবর্জিত বলবানের বল। আমি প্রাণিগণের ধর্মবিরুদ্ধ কাম॥ সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক যে সকল ভাব, তারা আমা হতেই জন্মে। আমি তাদের অধীন নই, কিন্তু তারা আমার অধীন। এই তিন ভাবের মোহে জগৎ মুগ্ধ। তাই পরম অব্যয় আমাকে জগৎ জানতে পারে না।

ভগবান্ অর্জুনকে শেষ কথা অর্থাৎ সার কথা শুনিয়েছেন :

অথবা কিং বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥[২]

—হে অর্জুন, এত বেশী জানার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা সকল জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।

উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—গীতায় নব কায়া পেয়েছে।

ভারতের দর্শনে পুরাণে ধর্মশাস্ত্রে কাব্যে এই চিরপুরাতন বাণীই বারংবার ঘোষিত হ'য়েছে। জড়ে জীবে সর্বত্র একের উপলব্ধি ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সহস্রশীর্ষ পুরুষ উপনিষদের সর্ব-ব্যাপী ব্রহ্ম

১ গীতা—৭।১০—১৩
২ ঐ—১১।৪২

আর গীতার সর্বশক্তিমান্ সর্বস্রষ্টা সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্ একই বস্তু। এমন কি সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈত-তত্ত্বও এই ঐক্য চিন্তা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। সাংখ্যের নির্লিপ্ত পুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

তস্মাত্তৎ সংযোগাদ্ চেতনং চেতনাদিব লিঙ্গম্।
গুণ কর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥[১]

—পুরুষের সন্নিধিহেতু সচেতন বুদ্ধি চৈতন্যলাভ করে। উদাসীন পুরুষ বুদ্ধির কর্তৃত্বে কর্তার ন্যায় হয়। এইজন্য নির্লিপ্ত পুরুষ লিপ্তের ন্যায় হয়।

নির্লিপ্ত পুরুষ প্রকৃতির সহযোগে সৃষ্টি করে থাকেন।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং প্রধানস্য
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥[২]

—অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু বসলে যেমন দেখা ও চলা দুই-ই চলে, সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ার জন্যই উভয়ের মিলনে হয় সৃষ্টি।

প্রধান বা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর। সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে থাকে বর্তমান।

পূর্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্ম-পর্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥[৩]

—সৃষ্টিকালে প্রত্যেক আত্মার জন্য সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীর অব্যাহত নিত্য। মন বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্ম শরীরের এই সপ্তদশ অবয়ব। এই সূক্ষ্ম শরীর এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য শরীরে গমন করে। স্থূল শরীর ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীর সুখ দুঃখ ভোগ করে না। প্রলয় কালে ইহার লয় হয়।[৪]

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা ছায়া।
তদ্বদ্ বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥[৫]

---

১ সাংখ্যকারিকা—২০।
২ ঐ —২১।
৩ ঐ —৪০।
৪ অনুবাদ—বিহারীলাল সরকার।
৫ সাংখ্যকারিকা—৪১।

—চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত, ছায়া যেরূপ বৃক্ষাদি ব্যতীত থাকে না। লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীর বা মহাভূত ছাড়া নিরাশ্রয় থাকে না।[১]

মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ভিন্ন দর্শনের লক্ষ্য বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সহজেই লক্ষিত হয়। সাংখ্য দর্শনের 'প্রকৃতি' সর্বশক্তিসম্পন্না হ'লেও নির্লিপ্ত পুরুষই প্রকৃত সৃষ্টির মূলে। কারণ পুরুষের প্রেরণা না পেলে প্রকৃতির সৃষ্টি ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং পুরুষ-প্রকৃতির অদ্বৈততত্ত্ব নিরাকার-নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্ব থেকে বেশী দূরে নয়। বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদও ভারতীয় ঐক্যচিন্তার পরিপোষক। বৈষ্ণব-দর্শনকেও বোধ হয় ঔপনিষদিক ধর্মেরই নবতর ভাষ্য বললে ভুল হবে না। বৈষ্ণব দর্শনের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। রাধা এবং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই। "লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।"

পুরাণে বিভিন্ন দেবতার স্তুতি এবং মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদেরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর উপাখ্যানে চণ্ডীর[২] স্তুতি প্রসঙ্গে চণ্ডীকে সর্বময়ী সর্বসৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মস্বরূপিণী রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

—হে দেবি, তুমিই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিতেছ, তুমি সর্বদা ইহাকে সৃষ্টি করিতেছ, তুমি ইহাকে পালন করিতেছ, অন্তকালে তুমি ইহাকে সংহার করিয়া থাক। হে জগন্ময়ি, বিবিধ বস্তুর সৃষ্টির সময়ে তুমিই একমাত্র সৃজ্য বস্তু হও পালনকালে তুমিই একমাত্র পাল্যরূপা হও এবং অন্তকালে তুমিই সংহার্যরূপা হইয়া থাক।[৩]

মহাশক্তি দেবতেজবিনির্মিতা চণ্ডী সমস্ত জগতের হেতু,—'হেতুঃ সমস্ত

১ অনুবাদ—বিহারীলাল সরকার।
২ চণ্ডী—১ম অঃ, ৬৮—৭১
৩ অনুবাদ—তারাচরণ কবিরত্ন।

জগতাম্'।[১] আবার দেবী নিজেই বলছেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।[২]—জগতে আমিই এক দ্বিতীয় কে আছে?

বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণু সর্গস্থিতিলয়ের কারণস্বরূপ এবং জগন্ময়:

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥[৩]

বিষ্ণু কালরূপী,—তিনিই ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ,—তিনিই সর্বব্যাপী:

তদেতৎ সর্বমেবাসীৎ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেন চ স্থিতম্ ॥[৪]

মহামায়া চণ্ডীর মতই বিষ্ণু সর্বময়—সর্বকর্তা:

স এব সর্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্ ॥
স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্তা
স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্তি-
বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ ॥[৫]

তিনিই সর্বদেবময় এবং বিশ্বময়:

নমামি নিত্যং ত্রিদশাধিপস্য
ভবস্য সূর্যস্য হুতাসনস্য।
সোমস্য রাজ্ঞো মরুতামনেক-
রূপং হরিং যজ্ঞতনুং নমস্তে ॥
দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং শরীরেণ দিশশ্চ সর্বাঃ
তমীড্যমীশং জগতাং প্রসূতিং
জনার্দনং তং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥[৬]

১ চণ্ডী—২।৭।
২ ঐ —১০।৫।
৩ বিষ্ণু পুরাণ—২য় অধ্যায়—১।
৪ ঐ ঐ ১৪
৫ বিষ্ণু পুরাণ ২য় অঃ ৬৫—৬৬।
৬ বরাহ পুরাণ ৬ষ্ঠ অঃ ১১।৫১।

শৈবপুরাণে শিব সম্বন্ধেও একই কথা। বায়ুপুরাণে শিব-স্তুতি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অব্যক্তং বৈ যস্য যোনিং বদন্তি
ব্যক্তদেহং কালমন্তর্গতঞ্চ।
বহ্নিং বক্ত্রং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে
দিশঃ শ্রোত্রে ঘ্রাণমাহুশ্চ বায়ুম্ ॥
বাচা বেদাংশ্চান্তরীক্ষং শরীরং
ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকূপান্।
সর্বাণি চাঙ্গানি তথৈব তানি
বিদ্যাশ্চাঙ্গানি যস্য পুচ্ছম্ ॥
তং দেবদেবং জননং জনানাং
সর্বেষু লোকেষু প্রতিষ্ঠিতঞ্চ।
বরং বরাণাং বরদং মহেশ্বরং
ব্রহ্মাণমাদিং প্রযতো নমস্তে ॥[১]

বামন পুরাণে দেবগণ কৃত নীলকণ্ঠ স্তুতিতে বলা হয়েছে :

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরানন স্ত্বং
ত্বমেব মৃত্যুর্বরদস্ত্বমেব।
ত্বমেব সূর্যো রজনীকরশ্চ
ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব ॥
ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব।
ত্বমেব চাদির্নিধনং ত্বমেব
স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥[২]

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দেবদেবীরাও একত্বেরই প্রতীক। তন্ত্রে বিষ্ণু এবং শিব বিশ্বভূতাত্মা। বিষ্ণুর স্তুতি প্রসঙ্গে তন্ত্র বলেছেন :

নমস্ত্রিমূর্তিভেদেন সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতি জিষ্ণবে পরমাত্মনে।

১ বায়ু পুরাণ—উত্তর ভাগ (৭১—৭৩)।
২ বামন পুরাণ—৫৪।১৮—১৯।

চক্রাভিন্নারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবন্ধবে ॥
বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতাত্মনে নমঃ।[১]

আবার শিব সম্পর্কেও তন্ত্র বলেছেন :

আদিমধ্যান্তশূন্যায় নিরস্তাশেষভীতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ ॥
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলিনে।
কন্দর্প-দর্প-কালায় কালহন্ত্রে নমো নমঃ ॥[২]

তন্ত্রশাস্ত্রের দেবী মহামায়াও ব্রহ্মস্বরূপিণী। "তত্ত্বমসি" এবং "সোঽহং" মন্ত্রে প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তিনিই দেবী মহামায়া। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি বা 'ব্রহ্মৈবাহমস্মি' ইতি বা 'যোঽহমস্মি' ইতি বা 'সোঽহমস্মি' ইতি বা 'যোঽসৌ সোঽহমস্মি' ইতি বা যা ভাব্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী বালাঽম্বিকেতি বা সকলেতি বা মাতঙ্গীতি স্বয়ম্বর কল্যাণীতি ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি······সাবিত্রী সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ কলেতি।[৩]

—এই আত্মা ব্রহ্ম, অথবা আমি ব্রহ্ম, যিনি আমি, অথবা তিনিই আমি, অথবা যিনি সেই, তিনিই আমি যা'ই ভাবনা কর না কেন, তা'ই ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা (মহাবিদ্যা) পঞ্চদশ অক্ষরবিশিষ্টা, মহাত্রিপুর সুন্দরী, বালা, অম্বিকা, সকলা, মাতঙ্গী, স্বয়ম্বর কল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী······সাবিত্রী, সরস্বতী অথবা ব্রহ্মানন্দকলা।

এক কথায় তন্ত্রশাস্ত্রেও এক ভিন্ন দুই নেই। ভারতবর্ষের বহু দেব-দেবী পরিকল্পনার মূলেও সেই একেরই তত্ত্ব।

একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ত্রিধা বিভিন্না বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা ॥

ঋগ্বেদের বহুদেবতা ও এক অখণ্ড দেবতায় পর্যবসিত।

১ প্রপঞ্চসারতন্ত্রম্—২১ পটল ৬৫—৬৭।
২ সারদা তিলকম্—২০ " ১৫৩—৫৪।
৩ বহ্বৃচোপনিষৎ।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গুরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥[১]

একেরই শক্তি—একেরই সৃষ্টি—একেরই প্রকাশ সব কিছু। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যচিন্তাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব এবং শাক্ত সাধনাতেও ঐ একই কথা।

রামপ্রসাদ প্রভৃতি শক্তি-উপাসকদের কালী ব্রহ্মময়ী।

জানো নারে মন পরম কারণ
শ্যামা কখনও মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ
কখনও কখনও পুরুষ হয়।

শ্যামা মাকে কে পারে গো চিনতে
তুমি ওমা উমা ব্রহ্মময়ী শ্যামা
কটাক্ষে পারো মা ত্রৈলোক্য জিনতে॥

দ্বিজ রাম-প্রসাদে রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে।
ওরে আঁখি-অন্ধ দেখ্ না চেয়ে
মা যে তিমিরে তিমির হরা।

ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তা ও সাধনা রবীন্দ্র-চেতনায় দৃঢ়মূল হয়েছে। য স্বাভাবিক এবং সঙ্গত তা-ই ঘটেছে। বিশ্ববোধ, জড়ে জীবে সমজ্ঞান,—বিশ্বের মাঝে নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধি—বিশ্বের সঙ্গে নিজের একাত্মতা চিন্তা ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের সাধনার ফল। কবি লিখেছেন, ভারত-বর্ষে সাধনার সত্য সম্পর্কে, "তাই আজ আমাদের অবহিত হ'য়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করিতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকত নয়, সে সত্য বিশ্ব-জাগতিকতা। সেই সত্য ভারত-বর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ব মানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্ম তপস্যা করেছেন এব কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি

ভারত-বর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ ক'রে গেছেন। 'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।" [১]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং লয়কর্তা,—তিনিই সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের বিষয়। এক শক্তি ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সকলকেই ঐক্যসূত্রে ধারণ ক'রে রেখেছেন। "এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম-শক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গল লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মত নিখিল জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোট হইতে বড় পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকু ও লক্ষ যোজন দূরবর্তী সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারকার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবররূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণুদের মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে একই পালনসূত্রে গ্রথিত।" [২]

পরমেশ্বর ব্রহ্মই কবিকে বিচিত্র পথ বেয়ে নিয়ে আসছেন যুগ যুগ ধরে। কবি লিখেছেন, "এই আমিটিকে আর-সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ, কিন্তু কারও সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলনি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্প-নির্ঝর দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে।" [৩]

বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার অনুভব যে ভারতের মনীষীরাই সাধনা দ্বারা লাভ করেছিলেন, একথা রবীন্দ্রনাথও বহুবার স্বীকার করেছেন। কবি বলেছেন,

১ তপোবন,—শিক্ষা।
২ শান্তং শিবমদ্বৈতম্—ধর্ম।
৩ বিশেষ—শান্তিনিকেতন।

"The west may believe in the soul of man but she does not really believe that the universe has a soul. Yet this is the belief of the East, and the whole mental contribution of the East is filled with the idea."[১]

"এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা—জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তির দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"[২]

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।[৩]

"তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর ক'রে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বারবার চলে এসেছে।"[৪]

"ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে, সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ।"[৫]

"দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি তিনি আবিরভূত। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ। সেই প্রকাশের কথায় ঋষি বলেছেন :

আবির্ বৈ নাম দেবতর্ তেনাস্তে পরিবৃতা

১ Personality

২ ভারতবর্ষ

৩ নৈবেদ্য-

৪ তপোবন

—সেই দেবতার নাম আবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরিবৃত, এই যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা।"[১]

"যে ওষধি—বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যান-পরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন :

যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। · ···

······তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল, এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন।······

······এইজন্যই নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"[২]

"এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে। ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করেছে।"[৩]

"বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণী ও শুনি যেন,—দুইয়ে মিশে আছে। অরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ', শুনেছিলেন 'যৎ কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না—রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগল ; তার রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রৈতির নবনবোন্মেষ-শালিনী সৃষ্টির চির-প্রবাহকে

১ আত্মপরিচয়—৩

২ তপোবন,—শান্তিনিকেতন।

৩ ঐ ঐ ।

নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।" ১

বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় চিন্তাধারা থেকেই পেয়েছেন কবির উপরোক্ত উক্তিগুলি সে কথা অবশ্যই প্রমাণ করবে। এই অনুভূতির প্রথম সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা গেল মানসীর 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। সোনারতরী এবং পরবর্তী কাব্যে এই অনুভূতি আরও গভীর এবং পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা আত্মার স্বরূপ দর্শন করেছেন সাধনার দ্বারা। অনেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতার অপূর্ব অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। পুরুকুৎস-পুত্র ত্রসদস্যু রাজা নিজেকে স্বয়ং ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে ঘোষণা করেছিলেন :

অহং রাজা বরুণো মহ্যং অন্যসূর্য্যানি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজাসি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥
অহামিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
অষ্টেব বিশ্ব ভুবনানি বিদ্বান্ৎ সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ংচ ॥২

—আমিই রাজা বরুণ, আমার জন্যই দেবগণ সেই প্রসিদ্ধ অসুরবিঘাতক শক্তি ধারণ করেন। আমি সকলের ঈশ্বর। আমি ইন্দ্র আমি বরুণ, মহৎ বিস্তীর্ণ দুরবগাহ স্বরূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী (রজসী) আমিই। সকলেই পরিজ্ঞাত হ'য়ে আমিই প্রজাপতির মত বিশ্বভুবন প্রেরণ করি এবং আমিই দ্যাবা পৃথিবী ধারণ ক'রে থাকি।

ঋষি বামদেবও আত্মজ্ঞানে ভাস্বর হ'য়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নিজেকেই অনুভব করেছেন।

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ন্যৃঞ্জেহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥
অহং ভূমিমদদৎমার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহং আপো অনয়ং বাবশান মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্ ॥

১ ভূমিকা—বনবাণী।
২ ঋগ্বেদ—৪।৪২।২—৩।

অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নাকন্নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্।[১]

—আমি মনু (প্রজাপতি), আমি সর্বপ্রেরক সূর্য, মেধাবী কক্ষীবান্ নামক ঋষিও আমি, আর্জুনী-পুত্র কুৎস নামক ঋষিকে আমিই প্রসাধিত করি। উশনা নামক ক্রান্তদর্শী ঋষিও আমি। হে জনগণ, উক্তরূপ সত্যদ্রষ্টা আমাকে দেখ॥ আমি আর্যমানবকে ভূমি দান করেছি। হবিদানকারী মনুষ্যকে আমিই বৃষ্টিদান করি। আমিই শব্দকারী জলসমূহকে সর্বস্থানে প্রেরণ করি। দেবতারা আমার সংকল্প বহন করেন॥ আমিই ইন্দ্ররূপে সোমপানে মত্ত হ'য়ে নয়শত নিরানব্বই বার শম্বর নামক অসুরের পুর ধ্বংস করেছি। সকল যজ্ঞে অতিথি পরায়ণ দিবোদাস নামক রাজাকে পালন করেছি। দিবোদাসের প্রবেশযোগ্য করেছি শতসংখ্যক পুর॥

ভারতবর্ষেরই আর এক আত্মদ্রষ্টী ঋষি কবি (বাক্) ঘোষণা করেছিলেন:

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্॥
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যং প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্॥[২]

—আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য ও সমস্ত দেবতা (অথবা বিশ্বসংজ্ঞক দেবগণরূপে) বিচরণ করি। আমি মিত্রও বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ করিতেছি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবকে ধারণ করিতেছি। শত্রুদিগের সংহারকর্তা চন্দ্রকে (অভিষোতব্য সোমকে) আমি ধারণ করিতেছি; হবির্যুক্ত সোমযাগ করিয়া যে যজমান দেবতাদিগকে তৃপ্ত করে আমিই তাহাকে কর্মফলরূপ ধন দান করিয়া থাকি। আমিই ঈশ্বরী, আমি ধনদাত্রী, আমি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছি, অতএব আমিই যজ্ঞভাগীদিগের

১ ঋগ্বেদ ৪।২৬।১—৩॥
২ ঐ ১০।

প্রধান। আমি সকল স্থানেই সর্বত্র বর্তমান এবং সমস্ত পদার্থে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া আছি; তাদৃশ আমাকে যজ্ঞ-কারীরা সর্বত্র পূজা করিয়া থাকে। যে অন্ন ভোজন করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে কাহারও বাক্য শ্রবণ করে, সে তত্তৎশক্তিরূপে আমার দ্বারাই করিয়া থাকে ॥[১] উপনিষদের ঋষি বলছেন :

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো, হিরন্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥[২]

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির এই আত্মোপলব্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব চেতনার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আত্মার যুগযুগান্তর ব্যাপী নানারূপে সঞ্চরণের কথা ব্যক্ত করেছেন ঋষি কবির মত-ই।

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু ক'রে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত-ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে
সর্বত্র গামীরে ॥[৩]

মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।[৪]

---

১ অনুবাদ—শ্যামাচরণ কবিরত্ন।
২ কৈবল্যোপনিষৎ—১.২০
৩ আমি—পরিশেষ।
৪ বলাকা—৮।

এই অনুভূতির পরিচয় অন্যত্রও রয়েছে। এক জায়গায় কবি বলছেন:

আমি মগ্ন হয়ে ছিনু ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে;
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত আকাশতলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।
আজি গিয়াছিনু চলি মৃত্যু পরপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে,
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যতদূরে চাই,
আপনারে হারাবার নাই কোন ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।[১]

কখনও কবির মনে জেগে ওঠে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র আপন সত্তাকে ছড়িয়ে দেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বিদারিয়া
এ বক্ষ পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে
পুরবে পশ্চিমে; শৈবালে শাদ্বলে
তৃণে শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন রসে।[২]

১। অনবচ্ছিন্ন আমি,—কল্পনা।
২। বসুন্ধরা,—সোনারতরী।

শেষ সপ্তকের একটি কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ অথর্ব বেদের (২।১।৪) মন্ত্র দিয়ে সুরু ক'রে ঋষি কবির আত্মদর্শনেরই প্রতিধ্বনি তুলেছেন।

পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজাতমৃতস্য।—অথর্ব বেদ।
ঋষি কবি বলেছেন,
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথম-জাত অমৃতের সম্মুখে।

*　　*

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে
ম্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী,
"এই আমি প্রথম-জাত অমৃত।"

*　　*　　*

আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হলো সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

কবি অনুভব করেছেন, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আর কবি-চেতনা একাকার। কোথাও কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দুরূপে যে পরমাত্মা সেই অখণ্ড সত্তা কবিরই সত্তা।

আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তরযামী
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্র স্থলে।[১]

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কবি-চিত্তে মিশে গেছে একাকার হ'য়ে।

ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃ পুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।

---

১ উৎসর্গ, ২২

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে
অলস কবির এই সার্থকতা।[১]

রবীন্দ্রনাথ আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও ঔপনিষদিক তত্ত্বের প্রতিধ্বনি। "এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানব-পরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।"

এই পরমাত্মাই বিশ্ব-প্রকৃতিরও পরমাত্মা। প্রাণবন্ত বৃক্ষকে কবি বন্দনা করেছেন বনবানীতে:

অন্ধভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ—
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসার নিষ্ঠুর মরুস্থলে॥

কবি আত্মাও বৃক্ষের প্রাণরূপে জাগ্রত পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত।

ধ্যান চলে তোমার মাঝারে
গেছি আমি, জেনেছি—সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টি যজ্ঞে যেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধ রূপ।[২]

কবির রক্তের চাঞ্চল্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গতি চঞ্চলতার স্পন্দন অনুভব করা যায়।

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায়। নিত্যকাল ধরে

১ পত্রপুট,—সাত।
২ বনবাণী,—বৃক্ষবন্দনা।

অণুপরমাণুদের নৃত্য কলরোল
তোমারি আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।[১]

বৃক্ষলতার এই যে প্রাণস্পন্দন—এ আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'লেও ভারতের ঋষি বহু যুগ পূর্বে স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন :

সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাং অচৈতন্যং ন বিদ্যতে ॥[২]

—সুখদুঃখ অনুভব করায় এবং ছিন্ন হলে পুনরায় শাখাপত্রাদির উদ্গম হওয়ায় বৃক্ষগণকে জীবন্ত বলে গণ্য করছি—এদের অচেতন বলা চলে না। ব্রহ্মদর্শী আধুনিক ঋষির পক্ষে তাই সোচ্চারে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল :

ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে
অলস কবির এই সার্থকতা।[৩]

১ নৈবেদ্য—২৩।
২ মহাভারত, শান্তিপর্ব—১৭২।১০।
৩ পত্রপুট,—সাত।

পঞ্চম অধ্যায়

জন্মান্তর সৌহার্দ্য

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বৈক্যানুভূতি জন্ম-জন্মান্তর যুগ যুগান্তর পরিব্যাপ্ত ক'রে চির-বিরাজমান। এই মন্তব্যের পরিপোষক কবির উক্তি পূর্বের উদ্ধৃতিতে আছে সুবহুল। এই অনুভূতিতে ও বেদ-উপনিষদের প্রভাব ক্রিয়াশীল। পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম অব্যয় অনাদি অনন্ত। দেশ-কালের পরিমাপের তিনি ঊর্ধ্বে। বিশ্ব-যখন ছিল অস্ফুট অব্যক্ত—সৃষ্টি যখন হয় নি কিছুরই তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র সৎ-বস্তু। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেছেন, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"—হে সোম্য, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় এবং সৎস্বরূপই ছিল। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তদপোঽসৃজত। তা আ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।"[১]

সেই সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন, আমি বহু হইব—জন্মিব। (অতঃপর) তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল, আমি বহু হইব জন্মিব, অনন্তর সেই তেজ জল সৃষ্টি করিল। সেই তেজঃসৃষ্ট জলসমূহ আলোচনা করিল, আমরা বহু হইব জন্মিব; তাহারা পৃথিবী সৃষ্টি করিল।[২] (এখানে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী—পার্থিবং হি অন্নম্—শংকর; পৃথিবী বা অন্নম্—তৈত্তিরীয় ৯।৩)

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।"[৩]

—সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় আত্মাই ছিল। আত্মা ব্যতীত নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অপর কিছুই ছিল না। তিনি ঈক্ষণ করিলেন আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।[৪]

১ ছান্দোগ্য ৬ অঃ ২ খণ্ড ৩ (৪৫৫)।

২ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

৩ ঐতরেয় ১।১

৪ অনুবাদ—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ গিরি।

"স ইমাঁ লোকান সৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ। অদোঽম্ভঃ। পরেণ দিবম্, দ্যৌ প্রতিষ্ঠা। অন্তরীক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাত্তা আপঃ।"[১]

—সেই আত্মা চিন্তা করিবার পর এই লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্যুলোকের উপরিভাগে স্থিত ঐ মহঃ জন তপঃ সত্য এবং দেবগণের আশ্রয় দ্যুলোক—এ সমস্তই আনন্দময় অম্ভলোক। দ্যুলোকের অধোভাগে স্থিত সূর্যকরোদ্ভাসিত ভুবঃ লোক হইতেছে মরীচিলোক সমূহ; পৃথিবীর অধোভাগে স্থিত পাতালাদি লোকসমূহ হইতেছে আপ্ লোক।[২]

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেক সন্নব্যভৎ।"[৩]

—এই ব্রহ্মই সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি একক থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলেন না।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীত।"[৪]

—আত্মা অগ্রে এক ছিলেন। তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া হোক, তৎপরে আমি সন্ততিরূপে উৎপন্ন হব; আমার কর্মসাধক ধন হোক, আমি অভ্যুদয় ও মোক্ষের জন্য কর্ম করবো।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে।"[৫]

—এই অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। সেই অসৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত বা স্বয়ং কর্তা বলা হয়।[৬]

---

১ ঐতরেয় ১।২

২ অনুবাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি।

৩ বৃহদারণ্যক—১।৪।১১।

৪ ঐ ১।৪।১৭।

৫ তৈত্তিরীয়, ৭।২।

৬ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"[১]
—সেই পরমাত্মা এই কামনা করিলেন, "আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব।" তিনি সৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি আলোচনা করিয়া এই যাহা কিছু তৎসমুদায়ই সৃষ্টি করিলেন। উহা সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাতে প্রবেশ করিলেন।[২]

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥[৩]

—সর্বব্যাপী (চৈতন্যরূপী) এই পরমাত্মাই সকলের পূর্বে (হিরণ্যগর্ভরূপে) জাত হন; তিনিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে (বিরাটরূপে) অবস্থান করেন; তিনিই আবার মনুষ্যাদির শিশুরূপে জাত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তিনিই সর্বজীবের অন্তর্যামী হইয়া সর্বতোমুখ হইয়াছেন।[৪]

বিষ্ণু পুরাণ বলেছেন:

ত্রিগুণং তজ্ জগদ্যোনিরনাদি প্রভবাপ্যয়ম্
তেনাগ্রে সর্বমেবাসীৎ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু ॥[৫]

বিশ্বজগৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সৃষ্টির পূর্বে অখণ্ডচৈতন্যরূপে ব্রহ্মই ছিলেন একমাত্র সদ্‌বস্তু। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন যে, তিনি স্বয়ং বর্তমান ছিলেন সৃষ্টির পূর্বে। তাঁর কবি-সত্তা সৃষ্টির পূর্বে মিশিয়ে ছিল অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসত্তায়।

সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে তমসের পরপার
যেথা মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন ॥[৬]

১ তৈত্তিরীয়—অনুবাক ৬।
২ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৩ শ্বেতাশ্বতর—২ ১৬।
৪ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ
৫ বিষ্ণু পুরাণ—২।২১।
৬ জন্মদিনে ১৩।

পৃথিবী যখন জন্মায়নি সীমাহীন দিগন্তপ্রসারিত অসীম জলরাশির তলদেশে যখন ধীরে ধীরে সঞ্চিত হচ্ছে মৃত্তিকার স্তর তখনও কবি চৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন মৃত্তিকার স্তরের সঙ্গে,—সেই বহুশত, বহুলক্ষ-কোটি জন্ম পূর্বের স্মৃতি এখনও জাতিস্মর কবির চিত্তকে চঞ্চল ক'রে তোলে।

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাতভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবন-স্পন্দন
তব মাতৃ-হৃদয়ের, অতিক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্যতীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
তখন আছিলে তুমি অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল
না বুঝিয়া............
.........সেই আদি জননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা
অবাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারংবার।[১]

সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্তের অসীম—চৈতন্যে কবি লীন ছিলেন ; সমুদ্রগর্ভে ভ্রূণরূপে পৃথিবীর জন্মের সাথে সাথেই কবিও সেই ভ্রূণের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ; আবার পৃথিবী যেদিন মাথা তুললো সমুদ্রবক্ষে,—যেদিন ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হ'লো, সেদিনও কবির সত্তা সদ্যোজাত পৃথিবীর সংগে মিশে রইলো, নবজাত শিশু-পৃথিবীর মৃত্তিকার জীবন-স্পন্দে কবি-সত্তা হ'লো

১ সমুদ্রের প্রতি,—সোনারতরী।

স্পন্দিত। "আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান ক'রে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করচেন, তখন আমি এই পৃথিবীর মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলচে— তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাংগ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব শিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হ'ত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"[১]

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জলে তারা
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোত
অগ্নির আবর্ত ঘুরে উঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্বুদ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি[২] .. ..

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব এবং অত্যাশ্চর্য অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচকরা অনেকেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য চিন্তাশীল মণীষী ও দার্শনিকের প্রভাবের কথা বলেছেন। ৺অজিত কুমার চক্রবর্তী ডারউইনের ক্রমাভিব্যক্তিবাদের উল্লেখ করেছেন। অজিত কুমারেব মত 'জীবন দেবতা'

১ ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ৯ই ডিসেম্বর।

২ প্রাণ,—পরিশেষ।

আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে। "এই কবিতায় প্লেটোর জীবন-স্মৃতিবাদ, নিও-প্লেটোনিক মতবাদ,—জড়ে আত্মার অস্তিত্ব এবং জার্মাণ দার্শনিক শেলিং এর মতবাদ (Patoর Doctrine of Reminisicence; Neo-Platonic মতবাদ,—Doctrine of a Soul in in-animate objects; Schelling এর Doctrine of Identity) যেন একত্র মিশ্রিত হইয়া কবিত্বে মণ্ডিত হইয়াছে।"—'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা সম্পর্কে রবিরশ্মিকার ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য অযৌক্তিক না হতে পারে। কিন্তু জড়ে আত্মার অস্তিত্ব খোঁজার জন্য গ্রীস জার্মাণ পাড়ি দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। একথার অর্থ এই নয় যে পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তা-ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না, কিম্বা রবীন্দ্র মানসে পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের প্রভাব মোটেই কার্য্যকরী হয় নি। পাশ্চাত্য মনীষীদের ঋণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে রবীন্দ্র মানসে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব এত ব্যাপক এবং গভীর, তেমন ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাব নয়। জড়-জীবের একাত্মতার চিন্তা ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের। এবং এই ভারতীয় চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্থায়ী স্বাক্ষর রেখেছে। পুর্ববর্তী আলোচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের পুর্বোদ্ধৃত গদ্য পদ্য রচনায় এই সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের এই যে বিশ্বৈকাত্মকতার অনুভূতি তা কবির জীবন-দর্শন, প্রকৃতি-প্রেম, মানব-প্রেম, সৌন্দর্য-দর্শন, এমন কি কবির ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রাকেও প্রভাবিত করিছে। কবি তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি সম্পর্কে আর একস্থানে লিখেছেন, "প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই।...বাহিরের প্রকৃতিতে যেখান নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিত ভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে এই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোন তর্ক খাটিবে কি করিয়া।" [১]

১ জীবন স্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কবির এই উক্তিও প্রমাণ করে যে প্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড চৈতন্যের অভিন্নতা এবং কবিসত্তার একাত্মতাই কবির প্রকৃতি-তন্ময়তার মূলে। সর্বভূতান্তরাত্মা অসীম ভূমার স্পর্শই কবির কাছে প্রকৃতিকে এমন অপরূপ, এমন অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস ক'রে তুলেছে; আর সাথে সাথে প্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরাত্মার এমন নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-জন্মান্তরীয় প্রকৃতি-প্রীতির অনুভূতি মহাকবি কালিদাস-বর্ণিত জন্মান্তর সৌহার্দ্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কালিদাস বলেছেন, সুখী ব্যক্তিও সুন্দর জিনিষ দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; তার কারণ মানুষ পূর্বজন্মের সৌহার্দ্য স্মরণ ক'রে থাকে।

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি ॥[১]

পদ্মাতীরের শোভা (বসুন্ধরা) এবং সমুদ্রের শোভা (সমুদ্রের প্রতি) সন্দর্শন করে জন্মান্তর সৌহার্দ্যের স্মৃতি রবীন্দ্রচিত্তকে ব্যাকুল করেছে। কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে নানাস্থানে পড়েছে ঠিকই। তথাপি প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লক্ষকোটি বৎসরের একাত্মতা কালিদাসের প্রভাব-সঞ্জাত বলাও যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রকৃতিকে চেতনরূপে অনুভব করার মূলে পাশ্চাত্য রোমান্টিকতার প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সকলের উপরে জয়ী হয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কার। সৃষ্টির আদি থেকে প্রকৃতির সংগে অভিন্নতাবোধ বেদ-উপনিষদের প্রভাবেরই ফল।

সমুদ্রের প্রতি কবিতার পরিকল্পনায় বেদ-উপনিষদের প্রভাব অন্যভাবেও কার্যকরী হয়েছে। উপনিষদ্ বলেন, জলের সৃষ্টি আগে; তৎপরে জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি। অবশ্য এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথেও সামঞ্জস্য আছে; উপনিষদ বলেছেন, "এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধী ভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।"[২]

---

১ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—৫ম অংক

২ তৈত্তিরীয়, ২ অঃ ১ অনু।

—আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সমূহ, ওষধিসমূহ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ (অর্থাৎ মানুষ) উৎপন্ন হইল।[১]

"তদপোঽসৃজত। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।"[২]

—অনন্তর সেই তেজ জল সৃষ্টি করিল। সেই তেজঃ সৃষ্ট জল সমূহ আলোচনা করিল,—আমরা বহু হইব—জন্মিব। তাহারা পৃথিবী সৃষ্টি করিল।[৩]

রবীন্দ্রকাব্যেও দেখা যায় জল থেকেই পৃথিবীর জন্ম। সমুদ্রকে তাই তিনি অভিহিত করেছেন পৃথিবীর জন্মদাত্রী আদি জননীরূপে।

হে আদি—জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।[৪] আদিম জলরাশির বর্ণনায় কবি লিখেছেন,

তখন আছিলে তুমি অখণ্ড অকূল আত্মহারা।[৫]

আদি জননী সিন্ধুর গর্ভধারণের কল্পনাটি বৈদিক মন্ত্রে দেখা যায়।

তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবা সমাগচ্ছন্ত বিশ্বে।[৬]

—সেই বিশ্বকর্মাকে (স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে) জল প্রথমে গর্ভরূপে ধারণ করলেন, যে গর্ভে সকল দেবতা সঙ্গত (সম্মিলিত) ছিলেন।

অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণ বধ্নামি ত্বা ময়ি।[৭]

—হে প্রাণ, তোমাকে জলের গর্ভের মত দেহমধ্যে ধারণ করি।

অপাং গর্ভং দর্শতং ওষধীনাং বনা জজান সুভগা বিরূপম্।[৮]

অগ্নে বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপামসি।[৯]

ঋগ্বেদে অন্যত্রও জলের গর্ভে জগতের আত্মাস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির অবস্থানের কথা রয়েছে।

আপো হ যদ্বৃহতী র্বিশ্বমায়ন্—
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্
ততো দেবানং সমবর্ততাসুরেকঃ।[১০]

১ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ। ২ ছান্দোগ্য ২ খঃ ৬ অঃ ৩।৪। ৩ অনুবাদক—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। ৪ সমুদ্রের প্রতি। ৫ সমুদ্রের প্রতি। ৬ ঋগ্বেদ ১০।৮২।৬। ৭ অথর্ববেদ ১১।৩।২৬। ৮ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৫২ ৯ তৈত্তিরীয়সংহিতা—৪।২৩।৩ ১০ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৭।

বিশ্বব্যাপী অগ্নির জন্মদাত্রী বিশাল জলরাশি গর্ভ ধারণ করেছিলেন। সেই থেকে দেবগণের প্রাণভূত এক অদ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মের জন্ম হোল।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, "আপোহ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস। তা অকাময়ন্ত কথং নু প্রজামহি ইতি। তা অশ্রাম্যন্, তা স্তপোঽতপ্যন্ত। তাসু তপস্তপ্যমানাসু হিরণ্ময়মণ্ডং সম্বভূব। [১]

—সৃষ্টির পূর্বে ছিল কেবল জল। সেই জল সৃষ্টিকামনায় তপস্যার দ্বারা গর্ভে হিরণ্ময় অন্ড ধারণ করলো।

উপনিষদ্ বলছেন,

আপো হ বা ইদমাসন্ সলিলমেব স প্রজাপতিরেক পুষ্করপর্ণে সমভবৎ তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ততেদং সৃজেয়মিতি।[২]

—প্রথমে এই জলই সর্বব্যাপী ছিল, সেই সলিলে পদ্মপর্ণে প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন; তাঁর অন্তঃকরণে ইচ্ছা হোল, আমি জগৎ সৃষ্টি করবো।

সুতরাং সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র জলের অবস্থিতি, জলমধ্যে ভ্রূণরূপে পৃথিবীর অবস্থান এবং ভ্রূণরূপী পৃথিবীর সঙ্গে ব্রহ্মচৈতন্যরূপে কবি আত্মার অবস্থানের কল্পনাটি বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রভাব-সঞ্জাত—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

১ শত পথ ব্রাঃ ১০।১ ৬।১

২ নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ—১।৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

সীমা অসীমের তত্ত্ব

সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন-সাধন রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন, সৌন্দর্য দর্শন, এবং সাহিত্য চিন্তার মূল তত্ত্ব। কবির সমগ্র কাব্যচিন্তা এবং জীবন-চিন্তার চাবি-কাঠি এই তত্ত্বটি। কবি বিশ্বাস করতেন সীমা অসীম থেকে বিবিক্ত নয়, অসীম সীমার বন্ধন ছাড়া মূল্যহীন। জীবনের অথবা সাহিত্যের আদর্শ যেমন বাস্তব-বিমুখ নয়, বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেই আদর্শ স্বীয় মূল্যকে সার্থক ক'রে তোলে, তেমনি খণ্ড জীবন ও বৃহৎ জীবন, স্বদেশ প্রেম ও বিশ্ব-প্রেম, নরনারীর প্রেমের আদর্শ ও জাগতিক বাস্তব প্রেম, খণ্ড ও অখণ্ড সৌন্দর্য, সৃষ্টি ও স্রষ্টা—যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন,—কেউই একক সম্পূর্ণ নয় ;—একের সার্থকতা অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে,—দুই এ মিলে তবে পূর্ণতা। নচেৎ সীমা আর অসীম দুই-ই অসম্পূর্ণ। কবি নিজের কাব্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে মন্তব্য নিঃসংশয়ে সত্য। কবি লিখেছেন, "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনার পালা।"[১]

সীমার ও অসীমের মিলন তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের গদ্য এবং পদ্য রচনার নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভবই রবীন্দ্র-চিন্তার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রকৃতি-প্রীতির মূলেও এই তত্ত্ব। আত্ম-পরিচয় গ্রন্থে কবি লিখেছেন, "আমি কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া সসীম নাম দিয়া কোন জিনিষকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ।"

কবির বাল্যকালের কাব্যেই সীমা-অসীমের তত্ত্ব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। মানসী কাব্য থেকে এই তত্ত্ব সুপ্রকট হয়েছে, মানসী কাব্যগ্রন্থে কবি নিজের

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবন স্মৃতি।

কাব্য জিজ্ঞাসা সম্পর্কে সচেতন। কবি তাঁর কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন,

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা—
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।[২]

সীমা-অসীমের মিলন তত্ত্ব তত্ত্বরূপে ফুটে উঠেছে 'সোনার-তরী' থেকে। সোনার-তরী কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সোনার-তরী'র ব্যাখ্যা সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সীমা-অসীমের মিলনতত্ত্বই এখানে অনুস্যূত রয়েছে। বিশ্ব-সৌন্দর্যের প্লাবন বহে চলেছে। কবি নিজের ছোট্ট জীবনের ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য সম্ভোগ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বারা ফসল উৎপাদন করেছিলেন। সেই ফসল ব্যর্থ হোল না। অসীম সৌন্দর্যের সোনারতরীতে সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপায় স্থান পেয়ে সার্থক হ'য়ে উঠেছে। কবির উপভুক্ত সকল খণ্ড সুন্দর এবং কবির সৃষ্ট সকল সৌন্দর্য অসীম বিশ্ব-সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। "যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনারতরী।"

'পরশ পাথরে'র খ্যাপা এবং 'আকাশের চাঁদে'র নায়ক সীমা অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনকে ত্যাগ ক'রে ছুটেছে অসীমের সন্ধানে। তাই তাদের সাধনা হয়েছে ব্যর্থ। খ্যাপার প্রসংগে কবি বলেছেন :

তার এত অভিমান সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান
রাজ-সম্পদের লাগি নহে সে কাতর।
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর॥

পরশ পাথর খোঁজার মিথ্যা আশ্বাসে জীবনকে বঞ্চিত করলে খ্যাপা। তাই সে পরশ পাথর হাতে পেয়েও হারালো। আকাশের চাঁদের নায়কেরও চাঁদ পাওয়া হ'লো না। ব্যর্থতায় চিত্ত তার ভেঙ্গে পড়লো। যে জীবন ও জগৎকে সে উপেক্ষা করেছিল চাঁদ পাওয়ার অহংকারে, সেই জীবনকে ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার হাহাকারে 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটির সমাপ্তি ঘটেছে।

১, আত্মপরিচয়—১।
২ উপহার, মানসী।

হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরবী রাগিণী বাজে ;
দুবাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় ঐ জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল, তবু পিছে চেয়ে রহে
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়, তার বেশী কিছু নহে!
সোনার জীবন রহিল পড়িয়ে, কোথা সে চলিল ভেসে
শশীর লাগিয়ে কাঁদিতে গেল কি রবি-শশীহীন দেশে॥[1]

সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব কবি-চিত্তে। কবি-হৃদয় একবার অসীমের দিকে ছোটে বনের গান গাইতে আর একবার নীড়ে ফিরে আসে খাঁচার গান গাইবার জন্য। বনের পাখী অসীমের গান গায়, খাঁচার পাখী গায় সীমার গান। কবি-চিত্তের দুই অংশ,—একজন ছোটে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের সন্ধানে অথবা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে অসীম অনন্ত ঈশ্বরের স্তুতি করতে ;—অপরজন চায় সীমার বন্ধন,—খণ্ড সৌন্দর্য অথবা বিশ্বজগৎ ও জীবনের গানে কণ্ঠ মুখর ক'রে তুলতে। দুজনের মিলন হ'য়েও হয় না।

বনের পাখী বলে, 'আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখী বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার'।
বনের পাখী বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখী বলে, 'নিরালা সুখ কোনে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখী বলে, 'না,
সেথা কোথা উড়িবারে পাই!'
খাঁচার পাখী বলে, হায়
মেঘে কোথা বসিবার ঠাঁই!'[2]

খেয়ার 'নীড় ও আকাশ' কবিতাতেও এই দ্বন্দ্ব। কবি কখনও গান গাইছেন নীড়ের, কখনও কবি-চিত্তের আকুতি অসীম 'আকাশের অভিসারে। কবি মনের সংশয় সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে প্রশ্নের আকারে।

১ আকাশের চাঁদ—সোনারতরী। ২ দুই পাখী—সোনারতরী।

তবে কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জন গান ?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ ?

আকাশের গানে কবি-কণ্ঠ সরব হ'য়ে উঠলেও নীড়ের বন্ধন কবিকে টেনে নিয়ে আসে। কবি সীমার মাঝেই অসীমের আস্বাদ অনুভব করেন।

তবু নীড়েই ফিরে আসি
এমনি কাঁদি এমনি হাসি
তবুও এই ভালবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।[১]

'সোনারতরী'তেই সীমা ও অসীমের সত্যস্বরূপ কবি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই 'দুই পাখী'র দ্বন্দ্ব থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সীমা-অসীমের মিলন হয়েছে,—খাঁচার পাখীর খাঁচার গান আর বনের পাখীর বনের গান—নীড় আর আকাশ একাকার হ'য়ে মিলে মিশে সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে।'

আমাদেরি কুটির কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা॥[২]

মানুষ এবং দেবতা—স্বর্গ এবং মর্ত্য এখানে এক হ'য়ে গেছে। সীমা বাদ দিয়ে অসীমের চিন্তা আকাশ-কুসুম—অসীমকে বাদ দিয়ে সীমা অপূর্ণ, অসার্থক।

১ নীড় ও আকাশ—খেয়া।

২ বৈষ্ণব কবিতা—সোনারতরী।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রাহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।[১]

সৃষ্টির মধ্যেই আছে সীমা ও সীমাতীতের মিলনের ব্যাকুলতা। সীমা সীমাহীনের সঙ্গে মিলিত হ'য়েই আপন সার্থকতা খুঁজে পায়।

পেয়েছ আপন সীমা আজি তাই মৌন শান্ত হিয়া
সীমা-বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া ॥[২]

কবির নিকট অসীমের স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। এবং কবির বিশ্বাস, 'নীড়ের বাঁধন' ভুলে গিয়ে মুক্ত পরাণ ছড়িয়ে দেওয়াই মানব মনের প্রবণতা। "আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী, আর একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখীটাই বেশী গান গাহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাগিনীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।[৩]

১ উৎসর্গ—১৭। ২ উৎসর্গ—৪।২ ৩ বিহারীলাল—আধুনিক সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, তার কাব্য সাধনার একটি মাত্র পালা আছে,—সে পালা অসীম ও সীমার মিলন সাধনের পালা,—সে কথা যথার্থই সত্য।

কবি বিশ্বাস করেন যে সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করাতেই মানব-জীবনের চরিতার্থতা। "নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য সীমাবদ্ধ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম।......আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন, সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশী করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।"[১]

'ছবি' ও 'গানের' মধ্যেও কবি সীমা ও অসীমের দ্বৈত সত্তা অনুভব করেছেন:

"অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান।"[২]

বলা বাহুল্য সীমা-অসীমের মিলন তত্ত্ব ভারতীয় ঋষির সত্য দর্শনেরই প্রভাব-সঞ্জাত। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের 'Absolute' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একত্ব চিন্তার সাদৃশ্য আছে। "হেগেল জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন নাই, জড় ও চেতনের মধ্যে তিনি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেন নাই।......তিনি স্পিনোজার মত জড় ও চৈতন্যকে একই পদার্থের দুই রূপ বলিয়া গণ্য করিতেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ এবং সূক্ষ্ম স্থূলে অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।......হেগেলের মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন বলিয়া কিছু নাই। নূতন কিছুই হয় না। প্রজ্ঞা সনাতন তাহা স্থাণু, অচল ও চিরন্তন, তাহার মধ্যে আজ যাহার অস্তিত্ব নাই, কল্য

১ সীমার সার্থকতা—পথের সঞ্চয়।

২ জাপান যাত্রী—১৪

তাহার মধ্যে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব ; প্রজ্ঞা চিরবর্তমান—চিরপূর্ণ। প্রজ্ঞাই সমগ্র সত্তা। অপূর্ণতা তাহারই এক দেশ মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনা দেশ ও কালে সমগ্রের বিকাশের অংশ মাত্র।"[১]

"According to Hegel, there is only one real fact in the universe—namely, the absolute and anything which is less than the absolute is not entirely and completely a fact······ It is only in the absolute that all the partial ideas are embraced and made to cohere, and only of the absolute, therefore, that complete truth may be predicated."[২]

হেগেলের এই পূর্ণতার ধারণা রবীন্দ্রনাথের একত্ব ধারণার সঙ্গে কতকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিবর্তন-শীলতায় গভীর বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ণত্বে আস্থাশীল। সীমা-অসীমের মিলনে অখণ্ড পূর্ণতার ধারণা রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছেন ভারতীয় সংস্কার থেকে। রবীন্দ্রনাথের অসীম সীমায় ধরা দিয়েছেন বটে, কিন্তু অসীমের সত্তায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুও সত্তাবান,—কবির এই বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় সর্বভূতান্তরাত্মার ধারণা থেকে সম্ভূত। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সীমা-অসীমের একত্বেরই তত্ত্ব। এ জ্ঞান রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই লাভ করেছেন। পরমেশ্বর পরমব্রহ্ম বিরাট, উদার মহান্, অনন্ত অসীম—আকাশের তুল্যই সীমাহীন। তিনি ভূমা। "ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।"—অল্পে ত সুখ নেই,—সুখ ভূমাতে,—অতএব ভূমাকেই জানতে ইচ্ছা করবে। সেই ভূমাই ত সীমার মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়েছেন নিজেকে বহুধা বিভক্ত ক'রে ; সর্ব-ভূতের অন্তরাত্মা হ'য়ে অণুতে পরমাণুতে স্থাবরে জঙ্গমে বিরাজ করছেন ; রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। তিনি যেমন বিরাটতম, তেমনি অণুপরিমিত ও।

অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াম্ ॥[৩]

অণু থেকে ও অণুতর এবং মহৎ থেকে মহত্তর আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয় গুহায় আত্মারূপে বিরাজ করেন।

১ নব্যদর্শন,—হেগেল—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—তারকচন্দ্র রায়।
২ The great philosophies of the world by C, E. M. Joad.
৩ কঠ ১।২।২০ এবং শ্বেতাশ্বতার ৩।২০।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য-আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥[১]

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ (ও বর্তমান—এই তিন কালের) ঈশ্বর (শাসক) তাঁহাকে জানিলে কেহ আত্মাকে গোপন করে না।[২]

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাৎ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥[৩]

প্রকাশমানরূপে সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ব্রহ্ম হৃদয়সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত; তিনি সর্বাস্পদ—কারণ সচল বিহঙ্গমাদি, প্রাণাদিযুক্ত মনুষ্যাদি, নিমেষবান্ এবং নিমেষরহিত যাহা কিছু সমস্তই ইহাতে সমর্পিত রহিয়াছে। হে শিষ্যগণ, এই যিনি স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান, যিনি সকলের প্রার্থনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ (সর্বদোষশূন্য) এবং প্রাণিবর্গের জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে তোমাদের আত্মভূত বলিয়া জানিবে।[৪]

অতঃপরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বা মৃতা ভবন্তি ॥[৫]

—জগদাত্মক বিরাট হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট, বৃহৎ, বিভিন্ন শরীরে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত এবং জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইলে জীবগণ অমর হইয়া থাকে।[৬]

যোঽর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

১ কঠ ২।১।১২
২ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
৩ মুণ্ডক ২।২।১
৪ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৫ শ্বেতাশ্বতর—৩।৭।
৬ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥[১]

—যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্ম এবং যিনি স্থূল হইতেও স্থূল, যাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিগণ অবস্থিত, তিনিই সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ, তিনিই আবার বাক্ ও মন। সেই ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই অমৃত। হে সোম্য, তাঁহাকে ভেদ করিতে হইবে,—তাঁহাকেও ভেদ কর।[২]

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎ-স্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥[৩]

—বৃহৎ এবং দিব্য অচিন্ত্যরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্মতর উক্ত ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর হইতেও সুদূরে, অথচ এই দেহেই অতি নিকটে,—এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয়গুহাতেই অবস্থিত।[৪]

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক—
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥[৫]

যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কেহ-ই নাই, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল ভাবে নিজ প্রকাশাত্মক মহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষেরই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।[৬]

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা, শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা এষ ম আত্মন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষা-জ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।[৭]

১ মণ্ডুক ২।২।২
২ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৩ মণ্ডুক ৩।১।৭
৪ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৫ শ্বেতাশ্বতর—৩।৯।
৬ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৭ ছান্দোগ্য—৩।১৪।৩।

আমার হৃদয় মধ্যবর্তী উক্ত লক্ষণ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা যব অপেক্ষা এবং শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু; আমার হৃদয় মধ্যস্থ এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা অতিশয় মহান এবং দ্যুলোক অপেক্ষাও অতিশয় বৃহৎ [অধিক কি এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্]।[১]

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যেমন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—মহত্তর—মহত্তম, অপর-দিকে তেমনি তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র—অণু—অণুতম—দ্ব্যণুক—ত্র্যণুক তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। যেমন তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ—ধারণার অতীত—তেমনি তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে অবস্থিত। তিনিই সীমা,—তিনিই সীমাতীত। তিনি স্বয়ং পূর্ণ—আবার তাঁর প্রকাশ যা কিছু তা-ও পূর্ণ,—পূর্ণতার বিচ্ছেদ কোথাও নেই।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥[২]

পূর্ণের অংশস্বরূপ বিশ্বজগৎকে জেনে—সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি ক'রে অমৃতত্ব লাভই মানব-জীবনের চরিতার্থতা। তাই উপনিষৎ জগৎ, জীবন ও জাগতিক কর্মকে পরিত্যাগ করতে বলেন নি। উপনিষৎ উপদেশ দেন নি বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের উপাসনা করতে। বরং বলেছেন, পৃথিবীতে শতবর্ষ জীবিত থেকে পৃথিবীর রূপ, রস ভোগ করতে করতে—কর্ম করতে করতে ঈশ্বর উপাসনা করবে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথাহতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥[৩]

সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করতে করতে শতবর্ষ বাঁচতে ইচ্ছা করবে। এ ছাড়া অশুভ কর্ম থেকে মুক্ত হবার অন্য কোন পন্থা নেই।

মানুষকে কর্তব্যকর্ম এবং সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। ঈশ্বর চিন্তাও করতে হবে দুটির কোনটিকে বাদ দিলে শ্রেয়োলাভ অসম্ভব।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততঃ ভূয় এব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥[৪]

১ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
২ ঈশোপনিষৎ।
৩ ঈশ—২।
৪ ঐ—৯।

যাঁরা অবিদ্যা অর্থাৎ প্রেয় বা কর্মের উপাসনা করেন, তাঁরা অন্ধকার লোকে প্রবেশ করেন। আর যাঁরা কেবলমাত্র বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় লিপ্ত থাকেন (কর্মকে বাদ দিয়ে) তাঁরা আরও অন্ধকার লোকে প্রবেশ করেন। সুতরাং বিদ্যা-অবিদ্যা,—শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ,—আত্মজ্ঞান-জাগতিক কর্তব্য কর্ম,—এক কথায় সীমা-অসীম—এতদুভয়ের উপাসনা করতে হবে সম্মিলিত ভাবে, একটিকে ত্যাগ ক'রে অপরটিকে আশ্রয় করলে অন্ধতমঃ ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥[১]

—যিনি জানেন বিদ্যা ও অবিদ্যার একত্র অনুষ্ঠান সম্ভব, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে বিদ্যার দ্বারা অমৃত অর্জন করেন।

"নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি।"[২]

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদ। (কর্তা) বিদ্যা শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ-যোগযুক্ত হইয়া যাহা করে তাহা অতিশয় বীর্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।[৩]

বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনার কথাই একটু ভিন্ন ভাষায় বলেছেন উপনিষৎ।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥[৪]

শংকরাচার্য অসম্ভূতি শব্দের অর্থ করেছেন, "অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কামকর্মবীজভূতামদর্শনাত্মিকাম্।"—অর্থাৎ কাম এবং কর্মের বীজস্বরূপা অবিদ্যার কারণভূতা অব্যাকৃতা (অদৃশ্যরূপা) প্রকৃতি। তিনি সম্ভূতি শব্দের অর্থ করেছেন "কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ"। অসম্ভূতি সীমা—সম্ভূতি অসীম। উপনিষদ উপদেশ দিয়েছেন সম্ভূতি-অসম্ভূতির সমন্বয় সাধন করতে।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥[৫]

১ ঈশ—১১।
২ ছান্দোগ্য—১।১।১০।
৩ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সংখ্যা বেদান্ততীর্থ।
৪ ঈশ—১২।
৫ ঐ—১৪।

যে ব্যক্তি বিনাশ (অসম্ভূতি) অর্থাৎ কামকর্মবীজভূতা প্রকৃতি এবং সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম—উভয়েরই উপাসনা করেন। তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে সম্ভূতির উপাসনায় লাভ করেন অমৃত।

একথা অতি সুস্পষ্ট যে বেদ-উপনিষদের অনুশাসন জগৎ ও জীবন পরিত্যাগ নয়, সীমাকে উপেক্ষা নয়, আবার ঈশ্বর যিনি সীমাতীত তাঁর চিন্তা ত্যাগও নয়। পূর্ণ শতবৎসর পরিমিত জীবন ভোগ করাই ঋষির কাম্য। শতবর্ষ আয়ু কামনা করেছেন, ঋগ্বেদের ঋষিও।

শতং নো রাস্ব শরদো শরদো বিচক্ষে শ্যামায়ুংষি
সুধিতানি পূর্বা।[১]

আমাদের শত বৎসর দেখতে দাও। দেবতাগণ কর্তৃক (পুর্বৈঃ) সুষ্ঠু হিতযুক্ত শতবৎসর আয়ু যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দ্দুঃ ॥[২]

অহরহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে তুমি শত শরৎ জীবিত থাক, শত হেমন্ত, শত বসন্ত, জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা এবং বৃহস্পতি হবিদ্বারা প্রীত হয়ে এই ব্যক্তিকে একশত বৎসর আয়ু দান করুন।

এই মন্ত্রটিই অথর্ববেদে আছে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারেঃ

শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তান্ ছতমু বসন্তান্।
শতং ত ইন্দ্রো সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষা হার্ষমেনম্ ॥[৩]

ঋষি মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়েছেন সবিতার কাছেঃ

পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্ ॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম্। রোহেম শরদঃ শতম্ ॥
পুষেম শরদঃ শতম্। ভবেম শরদঃ শতম্ ॥
ভূয়েম শরদঃ শতম্। ভূয়সী শরদঃ শতম্ ॥[৪]

হে সূর্য তোমাকে শতবৎসর দেখবো, শত বৎসর বাঁচবো—শত বৎসর বুঝবো

১ ঋক—২।১৭।১০
২ ঐ—১০।১৬১।৪
৩ অথর্ব—২০।৯৬।৯।
৪ অথর্ব—১৯।৬৭।২—৮।

অর্থাৎ কাজ করবো। শত বৎসর প্রবুদ্ধ হবো, শত বৎসর পুষ্টিলাভ করবো—শত বৎসর থাকবো, শত বৎসর পুত্র-পৌত্র দ্বারা সম্ভূত হবো, শত বৎসরের অধিককাল থাকবো।

শত বৎসর জীবন-লাভ ঋষির কামনা সত্য। কিন্তু দীর্ঘ জীবন পার্থিব সুখে মগ্ন থাকার জন্য ত নয়। তাই উপনিষৎ বলেন, ভোগ করবে ত্যাগের দ্বারা—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"; মন যেন বিষয় বাসনার বশীভূত হ'য়ে না পড়ে। সীমা ও অসীমের সমন্বয়ে যে অখণ্ড এক তাঁকে উপলব্ধি করাই তোমার জীবন-ধারণের লক্ষ্য। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"—জগতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত জানবে। জগৎ ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং জগতের মাঝেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব কর।

সম্ভূতি এবং অসম্ভূতির যুগ্ম উপাসনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "উপনিষদ বলেন, সম্ভূতি ও অসম্ভূতিকে এক ক'রে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি,—যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি—যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত ক'রে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে! তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ তাই বলেন, শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।[১]

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি সম্পর্কে কবি একস্থানে লিখেছেন, "ঋষি বলেছেন: মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাই বা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই: ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। সংসারে যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাকত, তাহলে লোভই মানুষকে সবচেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটে যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম

১। মানুষের ধর্ম।

সাধনা। আর তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে লোভের দ্বারা নয়।"[১]

উপনিষদের সার সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, এই জগতে তিনি বাঁচতে চান, মরতে চান না—জগতে দীর্ঘ জীবন নিয়ে বৈরাগ্য সাধন না করেই সীমার মাঝে অসীমের আনন্দকে প্রত্যক্ষ করবেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।[২]

পরিণত বয়সে অসীমের আনন্দে অবগাহন ক'রে কবি আরও দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন :

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ-গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকার
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে
                    ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥[৩]

১ শিক্ষার মিলন—শিক্ষা। ২ প্রাণ কড়ি ও কোমল। ৩ নৈবেদ্য—৩০।

বৈরাগ্য সাধন না করে ও অসংখ্য বন্ধন স্বীকার ক'রে নিয়ে বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ কবির কাম্য। ভূমার আনন্দকে পাওয়ার জন্য জগৎ-সংসারকে আনন্দময়ের আনন্দরূপে দেখ্‌তে শেখাই কবির কাছে মুক্তি। এ বিষয়ে কবির আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হোল: "যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তা-সীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সম্বন্ধে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আবার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা।"[১]

সর্ব-বন্ধন মুক্ত ঈশ্বর 'সৃষ্টি বাঁধন পরে' বন্ধনের মাঝেই বাসা বেঁধেছেন।

সকল সংসার বন্ধে বন্ধন বিহীন
তোমার বন্ধন মুক্তি থাক চিরদিন।[২]

বিশ্ব চরাচরে নিত্যকাল ধরে চলেছে অখণ্ড প্রাণের প্রবাহ। তিনিই রূপে রূপে প্রবেশ করে নানারূপ ধারণ করেছেন। "সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী এক সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখ-দুঃখের নানা খণ্ড প্রকাশ চলেছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন-যাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ।"[৩]

খণ্ড ছাড়া অখণ্ডের অস্তিত্ব থাকে না, বন্ধন না থাকলে মুক্তির নেই সার্থকতা সীমা না থাকলে অসীম অর্থহীন। সুতরাং ঈশ্বরকে সত্যরূপে দেখা সীমা ও অসীমের মিলিত অদ্বয়রূপে দেখা। যিনি অসীম, তিনিই সীমা।

১ মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট ২।
২ নৈবেদ্য—২৮।
৩ মানুষের ধর্ম—পরিশিষ্ট।

একাধারে তুমিই আকাশ তুমিই নীড়,
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চয়ক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস ;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।[১]

মানুষের জীবনেও সীমা ও অসীমের দ্বৈত সত্তার অদ্বৈত লীলা। মানব জীবনে সসীমতা ও অসীমতা সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "আমাদের একদিক অহং আর একদিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়-কর্ম, মামলা-মোকদ্দমা এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই ; সে আকাশ অসীম বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আচ্ছন্ন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক, আমাতেই বদ্ধ আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।"[২] মানবজীবন থেকে সীমা বা অসীম—যে কোন একটিকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

"মানুষ একসঙ্গে সমগ্রকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে, তারপরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্যই কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার

১ নৈবেদ্য—৮১।

২ মানুষের ধর্ম।

ভয়ংকর জবাবদিহি আছে ; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।”[১]

নিজের জীবনে সীমা-অসীমের দ্বৈতলীলা সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ সচেতন। কবির সসীম অন্তরাত্মা অনন্ত অখণ্ড অসীম পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে উঠতে চায়।

আমার অতীত তুমি যেথা যেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন মাঝে সেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।

মধুমত্তম অসীমের স্পর্শ কবির জীবনকে মধুময় ক'রে তুলেছে।

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে—
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া

১ সমগ্র শান্তিনিকেতন।
২ নৈবেদ্য—৮২।

হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।[১]

আনন্দময় অনাদি অনন্ত ঈশ্বর নেমে আসেন কবির অন্তর লোকে—কবি আপন সত্তার মাঝে অনুভব করেন অসীমকে ;—অসীম সার্থক হয়ে ওঠে কবির সমীম সত্তাকে আশ্রয় করে।

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।[২]

সীমার মাঝে নিজেকে ধরা দিতে অসীম সাধনা করে চলেন।

ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলে আমি।[৩]

অসীম যেমন কবির মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতে করেন তপস্যা,—কবিরও তেমনি মর্ত্যলোকে আবির্ভাব অসীমের লীলা বৈচিত্র্য অনুভব করতে।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে।[৪]

পরম সুন্দর পরমজ্যোতির্ময় স্বয়ং প্রকাশ আনন্দময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিজ অন্তরে অনুভব ক'রে কবি প্রাণ আত্মহারা হ'য়ে উঠেছে। সমস্ত বিশ্ব সমগ্র সৃষ্টি কবির সত্তায় এসে মিশে যাচ্ছে।

---

১ গীতাঞ্জলি—১২০।
২ গীতাঞ্জলি—১২১।
৩ শ্যামলী—আমি।
৪ গীতাঞ্জলি—১৩০।

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
একী জ্যোতি, একী ব্যোম দীপ্ত দীপজ্বালা।
একী শ্যাম বসুন্ধরা সমুদ্রে চঞ্চল
পর্বতে কঠিন তবু পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। একী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম চলিতেছে সৃজনের জাল।
আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।
তোমারি মিলন শয্যা হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একী অপরূপ।[১]

বিশ্বের সর্বত্র অসীম অনন্ত ব্রহ্মের অস্তিত্বের অনুভূতি কবি নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন। 'ধর্ম' গ্রন্থে কবি লিখছেন, "প্রকাশ কোন খানে? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে এই যে অধোতে......এই যে উর্ধ্বে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এই যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এই যে আমার ইন্দ্রিয় মনকে অহোরাত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ, স উত্তরত। এই ত প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়।"

কবি বিশ্বাস করেন যে মনুষ্যের আচরিত কর্ম সেই এককেই অনুসন্ধান করে। একের এষণায়ই মানুষের জীবনযাত্রা। "বিশ্ব জগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন—মনই নানার মধ্যে সেই একক দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখ শান্তি মঙ্গল নাই। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ড খণ্ড মৃত্যু দ্বারা আহত তাড়িত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার

১ নৈবেদ্য—২৭।

স্বাভাবিক ধর্ম বশতঃই সকল জানিয়া, কখন না জানিয়া, কখন বক্রপথে কখনও সরল পথে, কখনও জ্ঞানের মধ্যে,—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফেরে।"[১]

অসীম কিভাবে সীমার মধ্যে ধরা পড়েন তা ও কবি ব্যাখ্যা করেছেন, "বিশ্ব জগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার ক'রে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা আকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো নয়। তাঁর ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে; নতুবা ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এই জন্যই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা আনন্দের দ্বারা।......

এমনি করেই যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকালস্বরূপ, খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে।"[২]

সীমার মাঝে অসীমকে দেখাই ঈশ্বরের আনন্দরূপকে দেখা,—তাকেই কবি বলেছেন অমৃতের সাক্ষাৎকার। "তাই উপনিষৎ আনন্দরূপমমৃতম্—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায়, যা ফুরিয়ে যায়, তাতে আমাদের আনন্দ নেই। যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি সেখানেই আমাদের আনন্দ।'[৩]

এই উক্তিগুলি প্রমাণ করে যে সীমা অসীমের তত্ত্ব উপনিষদেরই ব্রহ্মতত্ত্ব। অসীম ব্রহ্মের সীমারূপটি কি? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। অনন্ত ব্রহ্মের সীমা রূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে? তার উত্তর এই যে সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এই জন্য সত্য গতিমান। সত্য আপনার দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে সে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন—এইজন্যই

১ ধর্ম।

২ পার্থক্য—শান্তিনিকেতন।

৩ মুক্তি—ঐ।

মন্ত্রের এক প্রান্তে 'সত্যং' আর এক প্রান্তে 'অনন্তং ব্রহ্ম' তারই মাঝখানে 'জ্ঞান'।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে, কিন্তু সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে বলি সীমা, সেই সীমা ঐকান্তিক রূপে কোথাও নেই। তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম, সেই অসীম ও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপ গ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মনে প্রাণে যে, মানবজীবনের লক্ষ্য অসীম একের সঙ্গে মিলিত হওয়া। শুধু মানবজীবন কেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থ অসীমে মিশে নিজেকে চরিতার্থ করে। অসীমের সঙ্গে মিলন না হ'লে সীমার সার্থকতা অন্যভাবে হওয়া সম্ভব নয়।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

কবি সমস্ত জীবন ধরে অসীমের লীলা জগৎ জুড়ে প্রত্যক্ষ করেছেন—অসীমের লীলাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। আর পরম বিস্ময়ে এবং আনন্দে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন।

ঔপনিষদিক চেতনা এমনি গভীর রবীন্দ্র মানসে যে কবি সাহিত্য বিচার প্রসংগে সাহিত্যকেও সীমা অসীমের মিলন ভূমিরূপে বর্ণনা করেছেন। কবির বিশ্বাস, সাহিত্যে বাস্তব ঘটনা বা সীমার মধ্যে অসীম সত্যের স্বাদ লাভ করা যায়।

"যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞা নির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে থাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে; তাঁকে যখন পাই আনন্দ বোধে তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা—আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।"

১ একটি মন্ত্র,—শান্তিনিকেতন।

"যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এই জন্তে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হ'ল আমার সীমার দিকের কথা, এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন, আমি মানুষ, এটা হ'ল আমার অসীমের অভিমুখী কথা, এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে প্রকাশমান॥"[১]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা ও অসীম অনন্তকে লাভ করার জন্তে। ছন্দ দিয়ে কথা গেঁথে সীমার আড়ালে অসীমের স্পর্শও বার বার লাভ করেছেন কবি।

আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীত সাধনা মাঝে রহিয়াছে অসংখ্য আকুতি॥[২]

ভারতীয় চিন্তারই এক অপূর্ব ফল সীমা-অসীমের তত্ত্ব। শুধু বেদ উপনিষদ নয় সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি-তত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে সীমা অসীমেরই তত্ত্ব। পুরুষ মুক্ত নিত্য অনাসক্ত শুদ্ধ। প্রকৃতি জড় হ'লেও পুরুষের প্রেরণায় তার সৃষ্টি কার্য চলে। পুরুষের অস্তিত্ব বাদে প্রকৃতি হয় জড়,—অশক্ত। পঙ্গু এবং অন্ধের মত দুয়ের মিলনে চলে জগৎ প্রবাহ।

গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ মূর্তিতে সীমা ও অসীমের মিলন সহজেই লক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা—সর্বব্যাপী,—অপরদিকে তিনি অর্জুন-সখা,—অর্জুন-সারথি দ্বারকাপতি। পুরাণ তন্ত্রের দেবতারা ও কখনো অসীম অনন্ত মূর্তি,—কখনও তাঁরা ধারণ করেন আমাদের চিরপরিচিত চির প্রিয় বিগ্রহ,—নেমে আসেন মর্তের সীমায়। দেবী দুর্গা কখনও দিব্যরূপা,—কখনও গৌরীরূপা।

১ তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে।

২ প্রণাম—পরিশেষ।

দিব্যরূপামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।...
গৌরীরূপামহং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।...[১]

মেনার গর্ভে সতী যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি দিব্যরূপা।

কোটিসূর্যপ্রতীকাশং তেজোবিম্বং নিরাকুলম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানল শতোপমম্॥

* * *

সর্বতঃ পানিপাদান্তং সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখাম্।
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্॥

কিছু পরেই সতী প্রসন্নমূর্তি ধারণ করলেন :

নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপল সুগন্ধি চ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতাম্॥[২]

বিষ্ণু সম্পর্কে তন্ত্র বলছেন,

স্বসংবেদ্যস্বরূপাত্মন্নানন্দাত্মন্ নাময়।
অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ প্রসীদেশ নিরঞ্জন॥
প্রসীদ তুঙ্গতুঙ্গানাং প্রসীদ বিশ্বশোভন।
প্রসীদ স্পষ্টগম্ভীর গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে॥
প্রসীদাব্যক্ত বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামণোরণো।[৩]

এইানে বিষ্ণু অচিন্ত্যস্বরূপ অব্যক্ত আবার বিশ্বাত্মা,—তিনি তুঙ্গতম—আবার অণু অপেক্ষাও অণু অণুতম।

আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্।
প্রণম্য সর্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্॥[৪]

শিবের স্তুতি প্রসংগে পুরাণকার বলছেন :

প্রপদ্যে দেবমীশানং ত্বামজং চন্দ্রভূষণং
মহাদেবং মহাত্মানং বিশ্বস্য জগতঃ পতি :॥

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র, ৪ কাঃ ৬ পরিঃ, ৫—৬।

২ কূর্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ—১২ অঃ ৫২, ৫৮, ১৯৮।

৩ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২১ পটল ৫৬—৫৮।

৪ বিষ্ণু পুরাণ—২ অঃ ৫।

বিরূপাক্ষ সহস্রাক্ষ যক্ষ যক্ষেশ্বর প্রিয়।
সর্বতঃ পাণিপাদ ত্বং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখ॥
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি।[১]

বামণ পুরাণে শিবের মহাকালপুরুষরূপে মহাকাশব্যাপী বিরাট শরীরের বর্ণনা আছে।[২]

বৈষ্ণব দর্শনে ও সীমা অসীমের তত্ত্ব। রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্বকে এক হিসাবে সীমা-অসীমের তত্ত্ব বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম অনন্ত রসস্বরূপ পরমাত্মা।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।[৩]

রাধা কৃষ্ণের অংশ স্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি প্রকৃতিরূপা জীবাত্মা স্বরূপিণী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী॥

চৈতন্যচরিতামৃতকার ও ঐ এক কথাই বলেছেন:

জগৎ মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

স্কন্দ পুরাণ বলেন:

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমনাদসৌ।
আত্মরামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ॥

রাধা অসীমের অংশসম্ভূতা,—অসীম অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি,—পূর্ণতা

১ বামন পুরাণ—৪৭ অঃ ৬২, ৬৪—৬৫।
২ ঐ ৫ অঃ।
৩ চৈতন্য চরিতামৃত।

লাভ করার জন্য আরাধনা। কৃষ্ণ-আরাধনার পূর্ণতা কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে,—অসীমের সঙ্গে মিলনে।

সীমা-অসীমের মিলনতত্ত্ব ভারতবর্ষেরই। সম্প্রদায় ভেদে এই তত্ত্বের রূপ বদল হয়েছে। এই তত্ত্বই রবীন্দ্রমানসে সুদূর প্রসারী প্রভাব সঞ্চার ক'রে প্রধান তত্ত্বরূপে আসন দখল করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

জীবন দেবতা

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা'র তত্ত্ব সীমা ও অসীমের মিলনেরই তত্ত্ব। সোনারতরী কাব্য গ্রন্থে 'জীবন-দেবতা'র প্রবেশ, চিত্রায় 'জীবন দেবতা' তত্ত্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং পূর্ণরূপে বিকশিতা। পরবর্তী কাব্যেও 'জীবন দেবতা'র আত্ম-প্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটেছে। 'জীবন দেবতা'কে কেন্দ্র করে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে কবির 'আত্ম পরিচয়' রূপে 'জীবন দেবতা'র পরিচয় 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। 'জীবন-দেবতা'র মধ্যে অনেক সমালোচক অনেক তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। কেউ 'জীবন-দেবতা' কে জীবাত্মা রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ বলেন, 'জীবন দেবতা' কবি-জীবনের নিয়ন্ত্রী দেবতা, ইনি ঈশ্বর নন; আবার কেউ বলেন, কবির সৃজনী শক্তিই জীবনদেবতা রূপে কবি কর্তৃক বন্দিতা হয়েছেন; কেউ বা মনে করেন, জীবন-দেবতা অপর কেউ নন, ইনি কবির কাব্যলক্ষ্মী। রবীন্দ্র সমালোচক ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চিন্তা এবং 'জীবন-দেবতা' তত্ত্বের মধ্যে ডারউইনের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা Theory of Evolution এর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। "ডারুইনের ক্রমাভিব্যক্তিবাদে বলে যে এক আদিম জীব-কোষ হইতে এই নানা বিচিত্র জীব-দেহ সকল উদ্ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে।..........আদিম অ্যামিবা (amaeba) এবং জটিল মানবদেহ একই উপাদানে গঠিত, একই জীব কোষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। এই জীবকোষ বা প্রোটোপ্লাজমিক সেল ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর বূহ রচনা করিয়া জীবকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছে। মানুষের শরীরে বিশেষ ভাবে মানুষের মস্তিষ্কের জাল যেরূপ ঘন এবং ক্রিয়া যেরূপ দ্রুত ও গতিশীল এমন অন্য জীবদেহে বা জীব-মস্তিষ্কে নহে; আর সেই জন্য মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হইয়া উঠিয়াছে।...... সুতরাং ডারুইনের এই মত আশ্রয় করিয়া যদি কেহ বলেন যে আমি এক

সময়ে গাছ ছিলাম, তবে শুনিতে যতই অদ্ভুত লাগুক, রাগ করা মূঢ়তা এবং উপহাস করা ততোধিক মূঢ়তা।"[১]

অজিতবাবু ডারুইন শিষ্যদেরও মতবাদ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে তাঁদের মতের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সাদৃশ্য বর্তমান। "স্যামুয়েল বাট্‌লার ডারুইনের ঐ জীব কোষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্বের মতটিকে এই দিক দিয়া মানেন যে তাহার মধ্যে যেটা ইন্‌স্‌টিংট্‌ অর্থাৎ সংস্কার সে তাহার বহুযুগের সঞ্চিত স্মৃতি বই আর কিছুই নহে। তিনি ইন্‌স্‌টিংট্‌কে বলেন inherited memory এবং unconscions memory, অর্থাৎ পুর্বপুরুষাগত এবং সুপ্ত স্মৃতি বৈ সংস্কার আর কিছুই নয়।"[২]

অজিতকুমার বৈজ্ঞানিক ফেক্‌নারের মত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার চৈতন্য, তোমার চৈতন্য, প্রত্যেক মানুষের চৈতন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও অবিচ্ছিন্ন হইলেও এক অখণ্ড মানব-চৈতন্য মধ্যে মিলিয়া যায়। মানস-চৈতন্য যেমন ইন্দ্রিয়-চৈতন্যের পার্থক্য সকলকে মিলাইয়া লয়, মানব-চৈতন্য তেমনি ব্যক্তিগত মানস-চৈতন্যের পার্থক্য সকলকে মিলাইয়া লয়। মানব-চৈতন্য আবার সেই একই প্রণালীতে পশু-পক্ষী বৃক্ষলতার জীব-চৈতন্যে মিলিয়া যায়, জীব-চৈতন্য সূর্য প্রভৃতি গ্রহ-মণ্ডলের বিশ্ব চৈতন্যে পর্যবসিত হয়, এইরূপে চৈতন্য 'from synthesis to synthesis and height to height till an absolute universal conscionsness is reached—সমন্বয় হইতে সমন্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয় যাবৎ পর্যন্ত বিশ্ব-চৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা সে লাভ না করে।"[৩]

অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর মতের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। বের্গসঁ বলেছেন, "conscionsness is hyphen between past and future"—চেতনা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা হাইফেনের মত (সংযোগ স্থাপন করে)। বের্গসঁ বলেন, জড়ের চেতনার প্রভেদ এইখানে যে চেতনার দ্বারা আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুহূর্তের মধ্যে জড়-রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

১ জীবন দেবতা—কাব্য পরিক্রমা।
২ ঐ ঐ
৩ ঐ ঐ

ব্যাপার যাহা পরে ঘটিয়াছে তাহাকে ধারণার মধ্যে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই।”[১]

অজিতবাবু অবশ্য একথাও স্বীকার করেছেন যে ফেকনারের চৈতন্যময় বিশ্ব-পুরুষের সঙ্গে গীতার বিশ্বরূপের এবং উপনিষদের সর্বভূতান্তরাত্মার মিল আছে। বাস্তবিক পক্ষে ‘জীবন দেবতা’র স্বরূপ এবং কবি-কৃত ‘জীবন-দেবতা’র স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রণিধান করলে এই সত্য দৃঢ় প্রত্যয়ে পর্যবসিত হবে যে, ‘জীবন-দেবতা’-তত্ত্ব ডারুইন-বাটলার-ফেকনর-বের্গসঁর তত্ত্ব নয়,—জীবন দেবতা তত্ত্ব ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ তথা বামদেব ও বাকের সর্বব্যাপী আত্মা, উপনিষদের সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম—গীতার সর্বস্রষ্টা সর্বময় ভগবানের প্রভাব-সঞ্জাত এক অপূর্ব কল্পনার কাব্যরূপ। অবশ্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের প্রেরণা থাকা অসম্ভব নয়। তথাপি অন্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও যে ভারতীয় সংস্কার জয়ী হয়েছে—তাতে সন্দেহ নেই। ‘মানসী’তে অসীমের সীমা রচনা ক’রে কবি যে ‘মানসী প্রতিমা’ গড়তে চেয়েছিলেন, তাই পরবর্তী কাব্যে ‘জীবন দেবতা’র রূপ পরিগ্রহ করেছে।

অনাবশ্যক বোধে জীবন দেবতার ক্রমবিকাশ এবং কবির সাথে ‘জীবন দেবতা’র লীলা-বিলাসের আলোচনা এখানে করা হোল না। জীবন দেবতার স্বরূপই এখানে আলোচ্য। ‘জীবন দেবতা’কে কবি কখনও ‘জীবন-দেবতা,’ কখনও অন্তর্যামী কখনও লীলা-সঙ্গিনী প্রেয়সী, কখনও বা খেলার সঙ্গিনীরূপে কাব্যে ব্যবহার করেছেন। কখনও তিনি দেবী, কখনও তিনি প্রেয়সী। তিনিই কবিকে যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী চালিত করছেন। তিনিই কবির জীবনকে বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে পরম সার্থকতায় ভূষিত করেছেন। তিনিই কবির কাব্যের প্রেরণা,—কবির জীবনের নিয়ন্ত্রী। কবি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন, “কাব্য রচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ব-বিধানই দেখতে পাই,—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম… কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই

১ কাব্য পরিক্রমা।

ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।”[১] কবির কাব্যের অচিন্তিতপূর্ব তাৎপর্য সৃষ্টি করেন যিনি তিনিই কবির অন্তরলোকের অধিবাসিনী,—তিনিই কবির কর্মজীবন এবং কাব্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। কবি কৌতুকময়ী অন্তর্যামিনীকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন,

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।[২]

এই কবিতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় যে জীবন দেবতা কবির জীবনের তথা কাব্যের নিয়ন্ত্রী দেবতা। কবি যন্ত্র, জীবন দেবতা যন্ত্রী। যন্ত্রী ইচ্ছামত কবি-যন্ত্রে সুর তুলছেন এবং সেই সঙ্গীতে কবির সাথে অসীমের মিলন ঘটছে।

---

১ আত্মপরিচয়।

২ অন্তর্যামী—চিত্রা।

আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার
ব্যাথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনা ভরে গীত ঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ অপার বাসনা,—
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে।[১]

জীবন-দেবতাই কবি-জীবনের সর্বস্ব :

চিরদিবসের মর্মের ব্যাথা
শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী।[২]

কবির চালক তাঁর জীবন-দেবতা :

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।[৩]

জীবন-সর্বস্বরূপিণী জীবন-দেবতার সেবায় কবি নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়েছেন :

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙারি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।[৪]

১ অন্তর্যামী—চিত্রা।
২ ঐ—ঐ।
৩ ঐ—ঐ।
৪ জীবন দেবতা—চিত্রা।

জীবনদেবতা কবির জন্মজন্মান্তরের সাথী। তিনিই লক্ষ কোটি জন্ম কবিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও তিনি কবিকে চালিত করবেন।

হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া। [১]
তবে তাই হোক। দেবী অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে। [২]
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আর বার
চির পুরাতন মোরে—
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে। [৩]

কবি-আত্মা চিরপুরাতন, কবির জীবন দেবতাও চির পুরাতন। জীবন দেবতা ও কবির আন্তরসত্তা যে অভিন্ন। আন্তর-সত্তার সংগে কবির প্রেমলীলা বৈচিত্র্য কবির জীবনে এনে দিচ্ছে অসীমের স্পর্শ—কবির সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবনকে অসীম মহিমা দান করছে। "শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ দুঃখ তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছে। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ও আমার

১ উৎসর্গ—১৩।
২ চিত্রা—অন্তর্যামী।
৩ চিত্রা—জীবন দেবতা।

সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন,— তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।"[১]

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এত বড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি ;
জনতা বহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।
কতযুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি

১ আত্মপরিচয়।

তৃণ রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী—
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।" [১]

"কিন্তু নিজের প্রবাহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশ কালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই,—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের অণু পরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ; এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়— সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন ক'রে পরিব্যাপ্ত নেয়।" [২]

ঔপন্যাসিক ৺প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (শিলাইদহ, কুমারখালি, ৬ই চৈত্র ১৩০২) ও 'জীবন-দেবতা' তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। কবি লিখেছিলেন, "যিনি 'আমি' নামক এই ক্ষুদ্র লোকটিকে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহনক্ষত্র হইতে লোক-লোকান্তর যুগ যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন, যিনি আমাকে লইয়া অনাদি কালের ঘাট হইতে অনন্ত-

১ আত্মপরিচয়।

২ আত্মপরিচয়—১।

কালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়াছেন আমি জানি, সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্যে আমি তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রু হাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রাগ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই; যিনি বিশেষরূপে আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার অন্তরে আমি, যাঁহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।"

কবিকৃত ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে 'জীবন-দেবতা'-তত্ত্ব সীমা অসীমেরই মিলনতত্ত্বের এক নবতর অভিব্যক্তি। যিনি অসীম লীলাময়, আনন্দময়, যাঁর প্রকাশ রূপে রূপে সর্বভূতে—সেই পরমাত্মাই কবির জীবনে অন্তরতম সত্তা রূপে লীলা করছেন। কবির জীবন-সীমায় ধরা দিয়ে কবিকে অসীমের দিকে নিয়ে চলেছেন তিনি। তাই কবি-আত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে অভিন্নবোধে জন্ম-জন্মান্তর ধরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আত্মীয় হয়ে রয়েছেন। কবির অন্তরতম সত্তা জীবন দেবতারই প্রকাশ জগতের মাঝে বহু বিচিত্ররূপে।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
আবার, অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।[১]

'প্রভাত সঙ্গীতে' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পরে যে আনন্দানুভূতি কবিকে বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই অনুভূতিই ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হ'য়ে গভীরতর হ'য়ে নূতনতর তত্ত্বরূপে জীবন দেবতার কায়া পরিগ্রহ করেছে। জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কবি লিখ্ছেন, "আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে।

১ চিত্রা,—চিত্রা।

এক, যাকে বলে আমি, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে যা-কিছু। যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন, জন, মান, এই যা কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিছু পরম পুরুষ আছেন এই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে—নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে, নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে। কোন এক সময়ে দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবন-দেবতা শ্রেণীর কাব্যে।

'ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমিন, সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলাম, তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ।"[১]

'জীবন দেবতা' যে বিরাট অনন্ত-অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপের কবি সত্তারূপে প্রকাশ এবং লীলা তাতে আর কোন সংশয় থাকে না। কবিসত্তা অখণ্ড সত্তারই একটা খণ্ড প্রকাশ মাত্র। রবি-রশ্মিকার ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবন-দেবতার' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "যিনি পূর্ণ জীবনের অখণ্ড আনন্দানুভূতির মধ্যে বিরাজমান তিনিই জীবন-দেবতা। যিনি জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত উপকরণ লইয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিশ্বের সহিত কবি-জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করেন, যিনি বিশ্বের মধ্যদিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি অবলম্বন করিয়া কবির অগোচরে কবির মধ্যে বিরাজ করেন, কবির অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তি জীবনের সব সুখ দুঃখ ও সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান ও তাৎপর্যদান

---

১ মানুষের ধর্ম,—পরিশিষ্ট ২।

করে, কবির রূপ রূপান্তরকে ও জন্ম-জন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথে, যাহার মধ্যে কবি বিশ্ব চরাচরের স্বকীয় আত্মার ঐক্য অনুভব করেন, সেই শক্তিই হইতেছে জীবন দেবতা।"[১]

এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের দ্বারা ধৃত কবির একটি উক্তি স্মরণীয়। কবি বলেছেন, "আমার জীবনের realisation দুই প্রকারের—একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি, আরেকটি উপনিষদের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি।

জীবন দেবতা বিশ্ব দেবতা থেকে স্বতন্ত্র সত্তা নয়। ভগবান আমার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত আছেন, আবার বিশ্বকে বাদ দিয়ে এক জায়গায় শুধু আমারই সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত হয়েছেন। এই দুই মিলনের মধ্যে প্রাচীর তোলা যায় না।·········ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের দুটো দিক আছে—সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন বহুমুখিন, সেখানে তিনি বিশ্বদেবতা। যেখানে অন্তর্মুখিন সেখানে তিনি জীবন দেবতা।"[২]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "মানুষেরও দুইটি জীবন, একটি ব্যক্তিগত, অপরটি বিশ্বের আব্রহ্মস্তম্ব সমগ্র অণুপরমাণুর সহিত একাত্ম; এইখানেই জীবন রহস্যের দ্বন্দ্ব। একস্থানে আমি আমার অহংকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আর সকলের হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। আবার অন্যত্র এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের মধ্যে বিধৃত। ইহা স্বত বিরোধী হইলেও পরম সত্য। জীবন-দেবতা এই ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাতা, তিনি বিশ্বদেবতা নহেন। পৃথিবীর খণ্ড আহ্নিকগতির মতো মানুষের এই বিচ্ছিন্ন জীবন বহু পূর্বজন্মের দ্বারা একটি অখণ্ড জীবনস্রোত গাঁথিয়া তুলিতেছে। সেই অখণ্ডতার দেবতা বিশ্বদেবতা। কাজেই দেখা যাইতেছে, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা এক না হইলেও পরস্পর সম্বন্ধ, যেমন সম্বন্ধ মানুষের ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবন যেমন সংবদ্ধ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক আবর্তন।"[৩]

দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার ক'রে এক তত্ত্বই প্রতিপাদন করেছেন। কবির অন্তরতম দেবতা—অন্তর্যামীই কবির

১ রবি রশ্মি, পূর্বভাগে, চিত্রা, জীবনদেবতা।

২ জীবনদেবতা—দেশ পত্রিকা—১৩ জানুয়ারী, ১৩৬৮।

৩ রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ১ম, চিত্রা।

জীবনদেবতা। এই দেবতাকে এক অর্থে জীবাত্মাও বলা চলে,। অসীম সর্বভূতান্তরাত্মা অখণ্ড চৈতন্যেরই সীমীত প্রকাশ রবীন্দ্রসত্তারূপে। যিনি কবির অন্তর্যামী তিনিই অখণ্ড চৈতন্যরূপে বিশ্বের অন্তরাত্মা। কবি সত্তা ও বিশ্বসত্তা যেমন অভিন্ন তেমনি পৃথকও। এক হ'য়েও এক নয়;—মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়লেও যেমন মেঘ আর জল এক হ'য়েও এক নয়। কবির অন্তরতম সত্তা অনুভবের গাঢ়তায় বিশ্বসত্তায় বিলীন হয়ে যায়। তখন কবি উপলব্ধি করেন 'জীবন-দেবতা' বিশ্বদেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন—কবি সত্তা অসীমে প্রসারিত হয়েছে;—'সীমা হয়েছে অসীমের মাঝে হারা।'

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে।
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে,
তুমি চঞ্চল গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে
অলক গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।[১]

আবার,
অচল আলোকে রয়েছে দাঁড়ায়ে
কিরণ বসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ রস তরঙ্গে।[২]

১ চিত্রা—চিত্রা।
২ অন্তর্যামী—ঐ।

এই দেবতা যিনি অসীম হ'য়ে ও 'জীবন-দেবতা'রূপে সীমার মধ্যে ধরা দেন, অরূপ হ'য়েও রূপের মধ্যে যাঁর প্রকাশ—যিনি "সর্বভূতান্তরাত্মা সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ" তিনিই উপনিষদের—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণ :
চক্ষুষশ্চক্ষুঃ···· ··········

—শ্রোত্রের শ্রোত্র—,মনের মন,—বাক্যেরও বাক্য,—প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ।

তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রাণের প্রেরয়িতা—

যৎ প্রাণেন ন প্রাণতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।[১]

সেই প্রাণের প্রেরক,—ভূতে ভূতে প্রাণরূপে বিরাজিত ব্রহ্মই ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপ্ত ক'রে বিশ্বের অন্তরাত্মারূপে বিরাজিত। তাঁর সম্পর্কেই উপনিষদ বলেছেন,

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা।[২]

এই বিশ্বদেবতারই স্তুতি প্রসংগে ঋগ্বেদ বলেছেন।

বিশ্বতো চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ॥[৩]

জীবনদেবতা তত্ত্বে পাশ্চাত্ত্যচিন্তানায়কদের চিন্তার সাদৃশ্য সম্পর্কে রবি-রশ্মিকার বলেছেন, "কবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ যে অবস্থাকে বলিয়াছেন Serene and Blessed Mood. সক্রেটিস যাহাকে বলিয়াছেন Daemon, প্লেটো যাহাকে বলিয়াছেন আইডিয়া, কৃশ্চানদের কোয়েকার সম্প্রদায় যাহাকে বলেন অন্তরের আলোক, দার্শনিক ফেক্‌নার যাহাকে বলিয়াছেন ব্যক্তি-চৈতন্যাতীত মহাচৈতন্য, যাহা জীবনের পরিচালনী শক্তি, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ

১ কেনোপনিষৎ—১।৮।
২ মুণ্ডক—২।১।৪।
৩ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৩।

বলিয়াছেন অন্তর্যামী বা জীবন দেবতা। ইহাকেই H. G. Wells বলিয়াছেন The living reality in our lives (god the invisible king), the Driver of machine man."

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'তত্ত্বেও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তার সাদৃশ্য আছে সত্য, হয়ত বা তাঁদের চিন্তার প্রভাবও কম-বেশী কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু সকলের উর্ধ্বে স্বকীয় মহিমায় যে বিরাজ করছে সে ভারতীয় সংস্কার সর্বভূতান্তরাত্মা প্রাণের প্রাণ সর্বব্যাপী মহান্ পুরুষ চৈতন্যময় ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের আজন্মার্জিত মহান্ সংস্কার।

এই প্রসঙ্গে কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদা মূর্তির পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার সঙ্গে বিহারীলালের সারদার সাদৃশ্যও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলাল পরিকল্পিত সারদা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতই কখনও কবির প্রেয়সী, কখনও কবির উপাস্যা, কখনও বা বিশ্বব্যাপিণী জীবধাত্রী উষা গায়ত্রী। কখনও তিনি কবির সঙ্গে প্রেমলীলায় বিভোর—কবির মান অভিমান চলে প্রেয়সী সারদার সঙ্গে। কবি মানিনীর মান ভাঙ্গাতে বলেন,

বুঝিলাম অনুমানে
করুণা কটাক্ষ দানে
চাবে না আমার পানে, কবে না ও কথা;
কেন যে কবে না হায়
হৃদয় জানিতে চায়
সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যাথা ![১]

কখনও কবি ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আছেন,

অয়ি হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি ![২]

১ সারদামঙ্গল—২য় সর্গ, ১৩। ২ ঐ —ঐ, ১৫।

সারদা কবির হৃদয়েই বাসা বাঁধেন। কবির হৃদয়ে থেকেই কবিকে চালিত করেন।

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভালো লাগে;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহনাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।[২]

আবার কখনও সারদা বিশ্বব্যাপিনী মূর্তি নিয়ে কবির নিকটে আবির্ভূতা হন।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণ কমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা সীমন্তে শুকতারা জলে।
ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বুবর্ণ-নলিনী,
পাদ-পদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য রাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।[৩]

১ ১ম সর্গ—৭০।
২ ১ম সর্গ—গীতি।
৩ ঐ —১০।

আবার, জ্যোতির প্রবাহমাঝে
বিশ্ব-বিমোহিনী রাজে!
কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মধুরিমা,
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাত অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা।[১]

রবীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয় কবি বিহারীলাল-বন্দিতা সারদা রবি-কবির 'জীবন দেবতা'র বন্দনায় অল্পবিস্তর প্রভাব রেখে যাবে তাতেও আশ্চর্য কিছু নেই। তবে একথাও স্মর্তব্য যে বিলারীলালের সারদায় বেদের আত্মতত্ত্বই প্রভাব সঞ্চার করেছে। অসীম সত্তার সসীম প্রকাশ ভারতীয় কাব্য-পুরাণে দর্শনে সর্বত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী যিনি 'সর্বভূতেষু' গুণ, শক্তি, প্রাণ ইত্যাদি রূপে বিরাজিতা, তিনিই ব্রহ্মরূপিণী অদ্বিতীয়া। দেবী-ভাগবতে শক্তিরূপিণী এই দেবীই—

সহস্র নয়না রামা সহস্রকর সংযুতা
সহস্র বদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥[২]

ঋগ্বেদের 'উর্বশী' উপাখ্যান যে সূক্ষ্মপ্রভাব ফেলেনি তা-ও বলা যায় না।

রবীন্দ্র প্রতিভা সমন্বয়ের প্রতিভা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর কাব্যে। উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ভারতীয় কবিদের কাব্যকল্পনা এবং বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব কম নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমের আদর্শে যেমন বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষনীয়, তেমনি 'জীবন-দেবতা'র লীলাবিলাসেও বৈষ্ণবীয় ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। "এই যে রূপের ভিতর দিয়া ভাবের প্রকাশ এবং আত্মানুভূতি আবার ভাবের ভিতরে রূপের সার্থকতা, এই দৃষ্টিই বৈষ্ণব-দৃষ্টি। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের উর্ধে উঠিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, এই দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বব্যাখ্যা। রাধার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—সে শুধু 'কৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতি-হ্লাদিনী শক্তিঃ"—

১ —৩য় সর্গ ১০।
২ দেবীভাগবত—৩.৩।৪৮।

'মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ'।……রাধাপ্রেমের ভিতর দিয়া কৃষ্ণের যেমন আত্মোপলব্ধি, তেমনি শ্যামসোহাগিনীত্বের ভিতরে রাধার সকল পূর্ণতা। ………রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-দেবতাকে কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মতবাদের আওতায় আনিয়া ফেলিতে চাহেন নাই; তথাপি মনে হয় উপনিষদের একটা প্রভাবের সহিত এই বৈষ্ণব আদর্শটিও রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[১]

বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের প্রভাব এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কষ্ট কল্পনা বলেই মনে হয়। কারণ এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রভাব স্বীকার করলে সাংখ্যদর্শন, পুরাণ, গীতা, কাব্য কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। প্রকৃত পক্ষে বেদ-উপনিষদের আত্মতত্ত্বই ভারতীয় চিন্তার সর্বস্তরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। Thompson তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের প্রভাব স্বীকার করেছেন। "The idea has a double stand. There is the Vaishnava dualism—always keeping the separateness of the self and there is the upanishadic monism. God is wooing each individual; and God is also the ground-reality of all as in the vedantist unification. When the Jibandevata came to me, I felt an over whelming joy it seemed a discovery, new with me—in this deepest self-seeking expression. I wished to sink into it—to give myself up wholly to it. To-day, I am on the same plane as my readers, I am trying to find what the Jibandevata was."

বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সীমা-অসীমের লীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। সীমার মধ্যে সীমাতীতকে দেখাই তাঁর মতে বৈষ্ণবের আদর্শ। তিনি লিখেছেন, "বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাংকুরটিকে বেষ্টন

১ রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা—বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"[১] এক কথায় "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" কেবল সীমার মাঝে অসীমকে অনুভব করাই নয়,—কবি বলেন, অসীমের সীমার মাঝে আত্মপ্রকাশ ও বৈষ্ণব ধর্মের মুখ্য তত্ত্ব। "মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিষকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন।'[২]

The Religion of man গ্রন্থে কবি বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। "I was sure that these poets were speaking about the Supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—the love of nature's beauty, the animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between man and man the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependence for a fulfilment that needs perfect union of individuals and the universal."

ছিন্নপত্রের একস্থানে কবি লিখছেন, "প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দ ঝঙ্কার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ, এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে,—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন।"[৩]

কবির এই সকল উক্তি যেন স্পষ্টতঃই স্বীকৃতি জানায় যে সীমা-অসীমের মিলন তত্ত্ব তথা আত্মতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় লীলাতত্ত্ব মিশে রয়েছে 'জীবন-

১ মনুষ্য—পঞ্চভূত।

২ শান্তিনিকেতন—সামঞ্জস্য।

৩ ছিন্নপত্র, কুষ্টিয়ার পথে, ২০শে আগষ্ট, ১৮৯৪।

দেবতা' তত্ত্বে। বস্তুতঃ 'জীবন দেবতা'কে 'লীলাসঙ্গিনী' প্রেয়সীরূপে কল্পনা বৈষ্ণব দর্শনের 'মধুর রতি'র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে মনে হ'ল যেন চিনি
ওগো নিরুপমা কবে প্রিয়তমা ছিলে লীলাসঙ্গিনী।[১]

আজন্ম সহচরী লীলাসঙ্গিনীর খেলার সঙ্গে কবি নিজের খেলাকে মিশিয়ে দিয়ে জীবনের সার্থকতা অর্জন করবেন।

তোমার খেলায় আমার খেলা মিশিয়ে দেব তবে।
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।[২]

যিনি কবির লীলা-সঙ্গিনী—তিনিই কবির মর্ম-সহচরী,—তিনিই কবির জীবন-দেবতা।

ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[৩]

বৈষ্ণব দর্শনের রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্ব সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, 'রাধাকৃষ্ণের প্রেম জীব এবং বিশ্ব-দেবতার ভিতরকার অনাদি প্রেমসম্বন্ধেরই প্রতীক মাত্র। এ প্রেম সম্বন্ধের ভিতর রহিয়াছে উভয়েরই পূর্ণত্বলাভের একটা পারস্পরিক অপেক্ষা; অর্থাৎ কাহাকেও বাদ দিয়াই কেহ পূর্ণ নয়,—সীমা তাহার পূর্ণত্ব খুঁজিতেছে অসীমের ভিতরে, অসীম আবার বিকাশের পূর্ণত্ব আত্মোপলব্ধির পূর্ণত্ব খুঁজিতেছে সীমার মধ্যদিয়া। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবধারার ভিতরে উপনিষদের পটভূমিকায় একাধারে হেগেলের মতবাদটি এবং বৈষ্ণব মতবাদটি মিশিয়া আছে।"[৪]

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে আত্মতত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কবির

১ পূরবী—লীলাসঙ্গিনী।
২ ঐ —খেলা।
৩ সোনারতরী—মানস সুন্দরী।
৪ রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা—বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগ।

একটি উক্তিতে ও "জীবন দেবতাতত্ত্বে" দুই তত্ত্বের মিশ্রণের স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। তিনি বলেছেন, "আমার অনেক কবিতা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি তা বিশ্বজনীন ও বটে। কারণ আমার জীবনদেবতা আমাতেও আছে, আবার আমাকে অতিক্রম করেও বর্তমান। আমার ব্যক্তিত্ব একজায়গায় বিশ্বে merge করেছি।.........

বৈষ্ণব কবিতার মূল সুর ব্যক্তিগত আর উপনিষদ মূলত বিশ্বজনীন। দুটোই সাধনার বিভিন্ন মার্গ। জীবনদেবতার ideal টা grow করেছে, এবং ক্রমশঃ একটি আকার ধারণ করেছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার অধিদেবতা একটি নির্দিষ্ট symbolism এর মধ্যে পাকা হয়ে বিরাজ করছে—একটা বিশেষ ধর্মমতের মধ্যে ধরা পড়েছে। আমি জীবনদেবতাকে বারংবার মূর্তি বদলে বদলে জানবার চেষ্টা করেছি।.........

এমনিভাবে আমি এক জায়গায় জীবন-দেবতাকে অতিক্রম করে বিশ্ব-দেবতার চরণতলে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখানে তাঁকে আমি তাঁর আপনার মহিমাতে দেখেছি। সেখানে আমি আপনার সখা বন্ধুদের পিছনে ফেলে এসেছি। সেই মিলনের আনন্দ ব্যক্তিত্বহীন।"[১]

১ জীবনদেবতা—দেশ, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮।

অষ্টম অধ্যায়

গতিতত্ত্ব

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে যে গতিশীলতা—যে গতিতত্ত্ব বলাকার উপজীব্য—সেই গতির প্রেরণাও বেদ উপনিষদ থেকে। গতিই জীবন—গতিই বিশ্বের একমাত্র সত্য; গতিই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূল রহস্য;—গতিশীলতার অভাবই মৃত্যু।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে
যে জাতি জীবনহারা অচল অসার
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে;—
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ প'রে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।[১]

কবি জানেন, কাল চির প্রবহমান,—দুর্বার অন্তহীন তার গতি। সে গতি যদি থামে কখনও তাহলে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে বিশ্বের প্রবাহ, লুপ্ত হবে জীবন,—ধ্বংস হ'য়ে যাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;—

১ দুই উপমা—চৈতালী।

অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আপনার মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।[১]

গ্রহ নক্ষত্র তৃণ, লতা গুল্ম সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালপ্রবাহে ছুটে চলেছে তীব্রগতিতে।

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো॥

* * *

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে যাও
কুড়ায়ে লও না কিছু, করো না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।[২]

১ বলাকা—৮
২ বলাকা—৮।

'বহু বরষের' বহু পুরাতন পৃথিবী 'অশ্রান্ত চরণে সবিতৃমণ্ডল' প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। কবি শুনতে পাচ্ছেন কালের বাধাহীন গতির পদধ্বনি।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন—
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।[১]

সংসারের ধর্মই ত চলা।

"আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেড়িয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয় তো কী মহারাজ। সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক। সেই তো কবি—বাউলের চেলা।[২]

পাগল নটরাজ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন মানুষকে।

ঠাকুরদাদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার যো কী? শিঙা যে বেজে উঠেছে।[৩]

বলাকার গতিবেগ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রচণ্ড গতিশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিল কবির চক্ষের সম্মুখে। কবি দেখলেন, বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম—সকল পদার্থই গতিশীল। এ গতির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কবিও মেতে উঠলেন গতির বন্দনায়।

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

---

১ শেষের কবিতা। ২ ফাল্গুনী। ৩ অরূপরতন।

পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরু শ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা
আমাদের খুঁজিতে কিনারা।
ঐ সন্ধ্যার স্বপ্নটুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
"হেথা নয় হেথা নয়, আর কোনখানে।"

* *

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখী ধায় আলো—অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন পারে
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের এ পাখার গানে
—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।"[১]

চতুর্দিকে গতির তীব্রতা কবি-চিত্তকেও চঞ্চল ক'রে তুলেছে, কবির দেহ-পিঞ্জরস্থ পক্ষী ও অনির্দেশ্য পথে ছুটতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। 'বলাকা'র এই কবিতাটী (৩৬ নং) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রকৃতিতে দেখলুম যে পর্বত অরণ্য শুদ্ধ হ'য়ে নেই, তারা চলেছে। তেমনি মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা—কামনা ভাবনা—তারাও লোকালয়ে তীরে তীরে এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১ বলাকা—৩৬।

আমার কয়েকটি পূর্ববর্তী কবিতাতেও এই ভাব ছিল। কোন্ অস্পষ্ট অতীতে মানুষের চিন্তধারায় সেই ভাবনা কামনার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবীকালের বাসা কোথায় জানি না, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, মানুষের চেষ্টা বাণী ইচ্ছা চিন্তা কর্মস্রোত দলে দলে আকাশ পূর্ণ ক'রে চলেছে। মানুষের এই যে অপূর্ণ অশ্রুতবাণী অতীত হ'তে যাত্রা ক'রে চলেছে, আমি শুনলুম তারা যেন বলাকার পাখার শব্দে জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে।"

ইউরোপে গতিবাদের প্রবক্তা হেরাক্লিটাস খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ঘোষণা করেছিলেন যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ("the totality of things) নিয়ত অপ্রতিহত-ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যা কিছু স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় রূপে ইন্দ্রিয় গোচর হয় তা ভ্রমমাত্র। এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বের চরম সত্য। এযুগের হেরাক্লিটাস ফরাসী দার্শনিক হেনরি বেঁর্গসঁর মতেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। জড় প্রকৃতি, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, পৃথিবীর গাছ-পালা, জীব-জন্তু, মানুষ—সবই কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টিগতভাবে সব সময়েই এক অপ্রতিহত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের মনও কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থির থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের সঙ্গে হেরাক্লিটাস বা বের্গসঁর গতিতত্ত্বের মিল আছে সেই জন্যই অনেকে মনে করেন যে গতির ধারণা রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। বের্গসঁর মতে, "There is no feeling, no idea, no volition which is not under-going change every moment: if a mental state ceased to vary, its duration would cease to flow.……………The truth is that we change without ceasing and that the state itself is nothing but change."[১]

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এক সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে পড়ে। জড়-চেতন কোন কিছুই পরিবর্তন বা গতির বহির্ভূত নয়। যাকে বলি স্থায়িত্ব তা-ও আসলে পরিবর্তন ভিন্ন কিছুই নয়। বের্গসঁ বলেন,

১ Duration, Creative Evolution—Translated by A. Mitchell

"Duration is the continuons progress of the past which gnaws into the future and which swells as it advances. And as the past grows without ceasing, so also there is no limit to its preservation."[১]

মানুষের অভিজ্ঞতা অথবা ব্যক্তিত্ব ও পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। "Our personality, which is being built up each instant with its accumulated experience changes without ceasing……… Thurs our personality shoats, grows and ripens without ceasing. Each of its moments is something new added to what was before."[২]

কাল গতিশীল—মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলে চলে তৈরী করছে অনন্ত মহাকাল। এই গতি যখন থামবে তখন থাকবে না কিছুই। বের্গস ঘড়ির পেণ্ডুলামের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। "Move an imaginary pendulum, a mere mathemetical point, from its position of equilibrium : a perpetual oscillation is started, along, which points are placed next to points, and moments succeed moments. The space and time which thus arise has no more "positivity" than the moment itself. They represent the remoteness of the position artificially given to the pendulum from its normal position, what it lacks in-order to regain its normal stability. Bring it back to its normal position : Space, time and motion shrink to a mathematical point." ৩

কাল প্রবাহ সম্পর্কে বের্গস বলেছেন, "The flow of time might assume an infinite rapidity, the entire past, present, and future of material objects or of isolated systems might be

১ Duration—creative Evolution.

২ ঐ ঐ

৩ Plato and Aristotle— Creative Evalution.

spread out all at once in space, without there being anything to change either in the formulae of scientist or even in the language of common sense."[১]

কালের গতি জীবনে ও দোলা দেয়। তাই জীবন গতিশীল। যা জীবিত তাই গতিবিশিষ্ট। "Where-ever anything lives, there is, open some where, a register in which time is being inscribed".[২]

বের্গস‌ঁর গতিতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন, জগৎ ও জীবন গতিশীল তথা পরিবর্তনশীল। গতিই জীবন। কাল ও গতিশীল। অতীত থেকে বর্তমান—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম।

যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বল প্রাণ ?
সে তো কেবল পলক নিমেষ।
অতীতের মৃতভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার
না জানি কোথায় তার শেষ।[৩]

যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্ব আর বের্গস‌ঁর গতিতত্ত্ব এক নয়। দুই চিন্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গীতে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। একজনের দৃষ্টি জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবে আচ্ছন্ন, অপরজনের দৃষ্টি সর্বভূতান্তরাত্মা অখণ্ড চৈতন্যের অনুভূতিতে স্বচ্ছ। বের্গস‌ঁর গতিতত্ত্ব গতিতেই সীমাবদ্ধ—অফুরন্ত চলায়—অনন্ত পরিবর্তনে পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথের গতি ভূমানন্দ লাভের উদ্দেশ্যে,—তাঁর গতির সমাপ্তি পূর্ণতায়,—অনাদি অনন্ত অব্যয় ভূমা যিনি তাঁর মধ্যে লীন হ'য়ে সার্থক হ'য়ে ওঠায়!

তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে—
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহা বিস্ময়।[৪]

৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বের্গসঁর গতি কেবল অফুরন্ত

১ Organised bodies—Creative Evolution

২ Individuality and age— ঐ

৩ অনন্তমরণ প্রভাত সঙ্গীত

৪ প্রান্তিক, ১৩।

চলা মাত্র ; তাহা কোন লক্ষ্য দ্বারা নির্দিষ্ট নহে, কোন আনন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। এইখানে বের্গসঁ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব,—কবি কেবল গতিতেই তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, তিনি আনন্দরসের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন।"১

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "জড়বাদী বের্গসঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও চিন্তার একটা মিল থাকিলেও অ-মিল আছে অনেকখানি। বের্গসঁ দেখিয়াছেন, একটা অফুরন্ত গতির বেগ, একটা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের স্রোত। সৃষ্টির এই নিরন্তর পরিবর্তন বা রূপান্তর, এই becoming একটা প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক ধারা মাত্র। এই গতির মধ্যেই বের্গসঁ সত্যের চরম রূপ দেখিয়াছেন। কিন্তু মিষ্টিক লীলাতত্ত্বরসিক রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন এই গতির একটা উদ্দেশ্য ও পরিণাম। নিরবচ্ছিন্ন গতি সত্যের একটা রূপ মাত্র, কিন্তু তাহার চরম রূপ নয়। দ্রুত বহমান বিশ্বপ্রবাহের মধ্য দিয়াই বিরাট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মানবজীবনও সেই সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বহন করিয়া।

এই ভাঙা-গড়া, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে মানব চলিয়াছে, সে এই বিশ্বলীলার অংশ রূপে, ঐ লীলার কাণ্ডারীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া, তাঁহার সহচর রূপে, জীবনের সার্থকতা পাইতে চায়, বার বার এই উত্থান-পতন, এই দুঃখ-বেদনা, ধ্বংস-মৃত্যু অর্থহীন নয়। ইহা গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ লীলাময়ের বিশ্বলীলার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা।"২

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, "দার্শনিক বার্গসঁ গতিবেগ ও পরিবর্তনের প্রবাহকে একটি মূল সূত্র রূপে ধরেছেন। তাঁর মতে দার্শনিকরা যে প্রকৃতির মূল শক্তিকে অচল, অব্যয় মনে করেন তা ভ্রমাত্মক। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন, কবি—কিন্তু তাঁর সমস্ত কাব্যের ধ্বনিতে বিশ্বের গতিবেগ 'বলাকা'র পক্ষবিস্তারে ভর করে দিগন্তে উধাও হয়েছে। সমাজে, রীতিতে, প্রথায়, মানবজীবনের সর্বাংশে এই চলনশীলতা তাঁর মনোহরণ করেছে। তিনি চঞ্চল। তিনি সুদূরের পিয়াসী। তথাপি একমেবাদ্বিতীয়ম্—যিনি অজ নিত্য শাশ্বত,—তাঁকেও তিনি জানেন। যা চঞ্চলরূপে প্রকাশিত তারই আর এক

১ রবিরশ্মি—বলাকা।
২ রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা।

রূপ স্থৈর্য। আকাশে যে নক্ষত্র চিরস্থির তা তো নৃত্যশীল অণুপরমাণুর নিয়ত ঘূর্ণ্যমান রূপ। বিপরীতের এই সমন্বয়েই যে অনন্তের বোধ তারই কথা কবি সর্বশেষ পার্শনালিটি নিবন্ধে ও নানাস্থানে বলেছেন। সেদিকে বিচার করলে বার্গসঁর চেয়েও হেগেলের মতের সঙ্গে তাঁর ঐক্য বেশী।"[১]

এই মন্তব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারাবাহিকতা এবং বিচিত্র ধরণের সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঔপনিষদিক আত্মতত্ত্বের সঙ্গে অন্বিত।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতায় বিশ্বাসী। সুতরাং তৎকর্তৃক বর্ণিত গতির লক্ষ্য অদ্বিতীয় একের মাঝে বিলীন হ'য়ে পূর্ণতা পাওয়া।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।[২]

গতি আমার এসে—
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।[৩]

এক হিসাবে এখানেও সীমা অসীমের লীলা। "সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।" সীমার গতি অসীমের দিকে,—অসীমে লীন হওয়াই তার চলার উদ্দেশ্য। অসীম যেমন সীমার মাঝে ধরা দেন নিজেকে, সীমাও তেমনি অসীমের মাঝে আত্ম-বিসর্জনের জন্যই চির-চঞ্চল, অসীমকে পাওয়া অর্থাৎ অসীমের মাঝে সীমার আত্মবিলুপ্তিই ত পূর্ণতা। সীমা তাই বাঁধন কেটে ছোটে অসীম অনন্তের উদ্দেশ্যে।

যেয়ো না যেয়ো না বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসারে যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে
কাঁদায়ে হাসায়ে।[৪]

---

১ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ, ক্লাস পৃঃ ১১৮।

২ বলাকা—৮। ৩ গীতালি—১০০।

৪ পরিশেষ—ধাবমান।

গতি-তত্ত্ব সম্পর্কে ভারতের জ্ঞান বহু প্রাচীন। গতির উপাসনা এদেশে বহু প্রাচীন। বেদ-উপনিষদে গতি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। রবীন্দ্রনাথের গতির উপাসনা বেদ-উপনিষদের প্রভাব সঞ্জাত। ঋগ্বেদে গতির কথা আছে। "চরন্তি যন্নদ্যস্ স্থুরাপঃ।"[১] যে জল প্রবাহিত হয় তাকেই বলে নদী,—যে জল স্থির গতিহীন, তাকেই বলে জল (আপ)।

পূর্বোদ্ধৃত "দুই উপমা" কবিতাটির স্রোতস্বতী এবং স্রোতোহীনা নদীর উপমা এই ঋক্‌মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি। ঋগ্বেদ অন্যত্র বলেছেন,

শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা
জরসং তনূনাং।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো
মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তো ॥[২]

—হে দেবগণ, যে অবস্থায় আমাদিগের শরীর সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির জরাকে আনয়ন করিতেছেন, যে অবস্থায় প্রতিপালনীয় পুত্রগণ প্রতিপালক পিতৃস্থানীয় হইতেছে; সেই অবস্থাতেই বহুসংখ্যক শরৎকাল ক্ষিপ্রগতিতে অলক্ষিতে চলিয়া যাইতেছে; আমাদিগের ক্ষয়শীল আয়ুর মধ্যে, হে দেবগণ, আমাদিগের প্রতি বিরূপ হইবেন না।[৩]

এই মন্ত্রটিতে কাল প্রবাহের উল্লেখ পাচ্ছি। ব্রহ্মবাদিনী বাক্ বলছেন, "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।—আমি রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবতার রূপে বিচরণ করি। "অহং বাত ইব প্রবামি।"—আমি বায়ুর মতই বেগে প্রবাহিত হই। এখানে ও গতির জ্ঞান স্পষ্ট। অথর্ববেদেও রয়েছে কালপ্রবাহের কথা। বলাকার কাল-প্রবাহের কল্পনায় ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রটির এবং অথর্ববেদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রের প্রেরণা সক্রিয় ব'লে মনে হয়। বলাকার ৮নং কবিতায় কালকে নদীরূপে কল্পনার মূলে পূর্বোক্ত ঋক্‌টির (৫।৪৭।৫) প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। অথর্ববেদের মন্ত্র দুটি:

কালো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমারোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিত স্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৪৭।৫

২ ঋগ্বেদ—১,৮৯।৮।

৩ অনুবাদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।

সপ্তচক্রান্ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভিরমৃতং ন্বক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ॥১

—সপ্তরশ্মি বিশিষ্ট (সপ্তরজ্জু বদ্ধ) সহস্রলোচন জরারহিত প্রভূত শক্তিশালী কালরূপ অশ্ব প্রবাহিত (ধাবিত) হচ্ছে। জ্ঞানী দ্রষ্টাগণ তাতে আরোহণ করেন, তার গন্তব্যস্থল বিশ্বভুবন। কাল সপ্তচক্র (ঋতু) বহন করে। এর নাভি সাতটি। এর অক্ষ অমৃত। সেই প্রথম দেবতা কাল, এই বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে গমন করেন॥

গতির জ্ঞান এর থেকে তীব্র এবং গভীর আর কোথায় পাওয়া যাবে? জ্ঞানী দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কালরূপ অশ্বে আরোহণ করে যুগ যুগান্তর পরিক্রমণ করে চলেছেন। কবি বলছেন:

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে॥২

সকল পদার্থই গতিশীল। স্থির নয় কেউই। অথর্ববেদ বলছেন:

কথং বাতো নেলয়তি
কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী-
র্নেলয়ন্তি কদাচনঃ॥৩

—বায়ু কেন স্থির থাকে না,—মন কেন স্থির থেকে আনন্দ পায় না,—সত্যকে লাভ করবার উদ্দেশ্যেই কি জল কখনও স্থির থাকে না?

১ অথর্ববেদ—১১।৫৩।১—২।
২ গীতিমাল্য—১৪।
৩ অথর্ববেদ—১০।৭।৩৭।

এখানে গতির উদ্দেশ্য সত্য বা পূর্ণতাকে লাভ করা,—অহেতুক চলা নয়। মন তাই স্থির থেকে আনন্দ পায় না।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয় খণ্ডে গতিবাদের জয়গান করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই 'চরৈবেতি' মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বরুণের কোপে উদরী-রোগে আক্রান্ত পিতা হরিশ্চন্দ্রকে দেখবার জন্য রোহিত যখন অরণ্য থেকে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে রোহিতকে উপদেশ দিলেন :

পাপো নৃষদ্বরো জন
ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা
চরৈবেতি চরৈবেতি।

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গতি হারালে পাপে লিপ্ত হন (তুচ্ছ হ'য়ে যান), ইন্দ্র (পরমেশ্বর) গতিশীল ব্যক্তির সখা। সুতরাং চলো, আগে চলো।

রোহিত এক বৎসর অরণ্যে ভ্রমণ করলেন। তারপর তিনি অরণ্য থেকে গ্রামে যাত্রা করলেন। ইন্দ্র পুরুষ রূপে রোহিতকে বললেন :

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে
ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ
শ্রমেণ প্রপথে হতা
শ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥

চলন্ত ব্যক্তির জঙ্ঘাদ্বয় পুষ্পযুক্ত হয় [যেমন পুষ্পযুক্ত বৃক্ষ বা লতা সুগন্ধি হওয়ায় সেবনীয় হয়, সেইরূপ চলন্ত ব্যক্তির জঙ্ঘা শ্রম জয় করার জন্য শ্লাঘ্য হয়]। চলন্ত ব্যক্তির বর্ধিষ্ণু আত্মা (আরোগ্যরূপ) ফললাভ করে। এই গমনশীল ব্যক্তির সকল পাপ প্রকৃষ্টপথে (তীর্থযাত্রা, দেবদর্শনাদি দ্বারা) শ্রমের দ্বারা ধ্বংস হয়ে শায়িত হয়। [যেমন শায়িত পুরুষ কৃষিবাণিজ্যাদি স্বকর্ম-সাধনে অক্ষম, তেমনি গতি-লব্ধ পুণ্য দ্বারা বিনষ্ট-পাপ পাপীকে নরকে প্রবেশ করাতে অসমর্থ হয়।] অতএব চলো—চলো।

এক বৎসর অরণ্যে ভ্রমণ করার পর গ্রামে এলে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র বললেন :

আস্তে ভগ আসীনস্যো-
র্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য
চরতি চরতো ভগ-
শ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥

—স্থির (উপবিষ্ট) ব্যক্তির সৌভাগ্যও স্থির থাকে (বর্ধিত হয় না)। উপবেশন ত্যাগ ক'রে উত্থানে উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্যও উর্ধ্বমুখী (বৃদ্ধি উন্মুখ) হয়। নিশ্চেষ্ট (ভূমিতে শয়নকারী) ব্যক্তির ভাগ্যও শয়ন করে (নিদ্রিত হয়; অর্থাৎ বিনষ্ট হয়)। চলন্ত ব্যক্তির ভাগ্য চলতে থাকে (অর্থাৎ দিন দিন বর্ধিত হয়)। অতএব চলো, চলো।

অবশেষে বৎসরান্তে ইন্দ্র রোহিতের কাছে গতি-ধর্মের ফলশ্রুতি ঘোষণা করেছেন :

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি
চরন্ স্বাদুমুদুম্বরং
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং
যো ন তন্দ্রয়তে চরং
শ্চরৈবেতি চরৈবেতি॥

চলতে চলতে মধু (বৃক্ষাগ্রেস্থিত মধুচক্র থেকে মধু অথবা অমৃত) লাভ হয়। চলতে চলতে স্বাদু উদুম্বর (ফল বিশেষ) লাভ হয়। দেখ, সূর্য সর্বত্র পরিভ্রমণ করেও অনলস থাকেন বলেই তিনি শ্রেষ্ঠ (জগদ্বরেণ্য)। অতএব চলো, এগিয়ে চলো।

ঋষির এই গতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি কি শুনতে পাই না রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যখন কবি আমাদের আহ্বান করেন উদাত্ত-গম্ভীর স্বরে এগিয়ে যাবার জন্ত?

আগে চল্, আগে চল্, ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কী বা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

দেখো যাত্রী যায়, জয়গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দঝরে, কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি!
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়
মহাবেগবান মানবহৃদয়
যারা বসে আছে তারা বড়ো নয়,
ছাড়ো ছাড়ো মিছে ছল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই॥[১]

আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাঁধবে।
রইলো যারা পিছনটানে কাঁদবে তারা কাঁদবে॥

কবির কাছে গতিহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর।

'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি।'

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গতির জ্ঞান স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রভাত সংগীতে নিদ্রাভঙ্গের পরেই কবি ঘোষণা করেছেন,

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব।"

'সোনারতরী'র কবি অনুভব করেছেন পৃথিবীর গতির সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে তাঁর চির-চঞ্চল সত্তার গতি। সৃষ্টির উষা থেকে তিনি সূর্য পরিক্রমা ক'রে চলেছেন পৃথিবীর প্রাণসত্তায় মিশে থেকে (বসুন্ধরা)। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', তও কবি যাত্রা করেছেন অসীম সৌন্দর্যকে ধরবার জন্যে। 'মানসী'র কবিতাতে ও গতির আকুলতা।

গতির দোলা লেগেছে কবির চিত্তে। তিনি চলেছেন ছুটে। তাঁর 'চরণে ঝটিকা গতি'। তিনি চিরদিনের যাত্রী। যুগ যুগান্তর ধরে চলেছেন তিনি, তাঁর অক্লান্ত গতির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। রূপে রূপে প্রাণে প্রাণে তাঁর গতি সর্বভূতের অন্তরাত্মা হ'য়ে।

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া

১ স্বদেশ—১৮।

চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।[১]

যুগ যুগ ধরে চলছে কবির পথ চলা ; সীমাহীন এই পথ,—এ পথের আদি নেই, অন্ত নেই। অনাদি কাল থেকে পথ চলতে চলতে এখন তিনি বর্তমান কালের ঘাটে এসে তরী ভিড়িয়েছেন।

যেন যাত্রী আমি অতিদূর ভাবী কাল হ'তে
মন্ত্র বলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিণু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই।[২]

কবির এই অনন্তকালের যাত্রায় কখনও কোন বাধা তিনি স্বীকার করবেন না।

যাত্রী আমি ওরে
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে।[৩]

কবির যাত্রা যে অনন্তকালের—আত্মারূপে,—জীবনধারা বেয়ে তিনি যে মর্তভূমিতে রবীন্দ্রনাথ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন—এই ভাবটী সুন্দর ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে গীতাঞ্জলির একটি গানে :

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,

১ বলাকা—৮। ২ প্রান্তিক—১৫।
৩ গীতাঞ্জলি,—১১৭।

তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
কতই নামে ডেকেছি যে
কতই ছবি এঁকেছি যে
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আশায়
হৃদয় গেছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।[১]

সুদূরের আহ্বান চিরদিনই কবির মনকে চঞ্চল ক'রে তোলে। দূরের ডাকে কবির জীবন-তরী বর্তমানের ঘাট ছাড়িয়ে আবার ভাসবে কাল-স্রোতে—অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে—কত যুগ যুগান্তর যাবে পেরিয়ে।

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূর দেশে
কিসের চিন্তা করিস পথ শেষে—
কোন দুঃখে কাঁদে প্রাণ।[২]

যাত্রী আমি ওরে
যা কিছু ভার যাবে সকল সরে
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে।[৩]

১। গীতাঞ্জলি—৬৫
২ চৈতালী—যাত্রী।
৩ গীতাঞ্জলি—১১৭।

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নতুন হ'লো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই রূপে রূপে নূতন হ'য়ে চলার অনুরূপ ভাবনা উপনিষদেও রয়েছে।

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।"[২]

এই যে কিছু জগৎ (গতিশীল) সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) থেকে নিঃসৃত হ'য়ে প্রাণ-সত্তায় কম্পিত হচ্ছে।

উপনিষদে এই চলারই কথা। উপনিষৎ বলেন, আত্মা গতিশীল। তিনি স্থির হ'য়েও দ্রুতগামী—সর্বব্যাপী।

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।"

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নাপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥[৩]

—সেই আত্মা এক এবং অচঞ্চল, অথচ মন অপেক্ষাও অধিকতর গতিশীল। এইজন্য দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়গণ) তাঁকে প্রাপ্ত হ'তে পারে না। তিনি নিশ্চল হ'য়েও দ্রুতগমনশীল অন্য সকলকে অতিক্রম করেন। মাতরিশ্বা (হিরণ্যগর্ভ) তাঁর সাহায্যে কর্মফল সম্পাদন করেন (অথবা বায়ু তাঁর মধ্যেই জল ধারণ ক'রে থাকেন)।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।"[৪]—হস্তপদ না থাকলেও তিনি দ্রুতগামী —সর্বগ্রাহী।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥[৫]

১ গীতালি—৮৩।
২ কঠ—২।২।২১।
৩ ঈশ—৪।
৪ শ্বেতাশ্বতর—৩।১৯।
৫ ঈশ—৫।

—তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে, তিনি নিকটে। তিনি সর্বজগতের অন্তরে ও বাহিরে।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম-
স্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।[১]

—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরশূন্য শুদ্ধ নিষ্পাপ জ্যোতির্ময় সর্বোপরি বর্তমান এবং স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন।

এতস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতম্।
প্রাণঃ প্রাণেন যাতি ॥[২]

এ সমস্তই প্রাণে সমর্পিত আছে। প্রাণ প্রাণের সাহায্যে গমন করে।

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ॥[৩]

সকল সত্তার (সর্ব-আজীবে) সকল আধারে এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে আত্মা ভ্রমণ করেন।

উপনিষদে বায়ুকে বলা হয়েছে যজ্ঞস্বরূপ, কারণ বায়ু গতিশীল।

"এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে এষ হ যন্নিদং
সর্বং পুনাতি; যদেষ যন্নিদং সর্বং পুণাতি, তস্মাদেষ যজ্ঞঃ।"[৪]

—ইহাই যজ্ঞ স্বরূপ, এই যাহা পবিত্রতা সম্পাদন পূর্বক গমন করিতেছে। কেন না, এই বায়ুই চলিতে চলিতে এই সমস্ত জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে। যেহেতু বায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ কে পবিত্র করে, সেই হেতুই ইহা যজ্ঞ স্বরূপ।[৫]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সূর্যের গমনশীলতার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্নোপনিষদে ও সূর্যের গতিশীলতার কথা বলা হয়েছে।

"ত্বমন্তরীক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ।"[৬]

১ ঐ—৮
২ ছান্দোগ্য—৭।১৫।১।
৩ শ্বেতাশ্বতর—১।৬।
৪ ছান্দোগ্য—৪ অঃ ১৬ খঃ, ১।
৫ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ।
৬ প্রশ্ন—২।১০।

উপনিষদে 'হংস' শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যকে 'হংস' বলার মধ্যে ও সূর্যের গতিশীলতার কথাটি অনুস্যূত আছে। 'হন্তি গচ্ছতি ইতি হংসঃ" (সায়ন) —'হংস' শব্দের অর্থই গতিশীল। প্রাণ বা আত্মা ও 'হংস' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়েছেন। "হন্তি গচ্ছতি কৃৎস্ন শরীরং ব্যাপ্য বর্ততে ইতি হংসঃ প্রাণঃ" (সায়ন)।

গতিশীলতায় বিশ্বাস আমাদের দেশে এমন ব্যাপক যে পৃথিবীর নামকরণের মধ্যেই পৃথিবীর গতির ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট ভাবে রয়ে গেছে। যে গমন করে সেই জগৎ (গম+ক্বিপ্); যা সংসৃত বা আবর্তিত হয় তাই সংসার (সং সৃয়তে ইতি সংসারঃ)।

গতির অস্তিত্ব সর্বত্রই। গতিই জীবন—গতিই আত্মা—গতিই জগৎ—গতিশীল সূর্য বায়ু গ্রহ নক্ষত্র সবই। কিন্তু গতি স্তব্ধ হ'লে জগতের অনিবার্য ধ্বংস,—সকল অস্তিত্বের বিলুপ্তি।

অথর্ব বেদ বলছেন,

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্
যদঙ্গ স সমুৎখিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন রাত্রী
নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন ॥[১]

সূর্য (বা আত্মা) আকাশ সলিল (পাঞ্চভৌতিক দেহ) থেকে একটি পা তুলে নিলেই সূর্যের (আত্মার) ভ্রমণ থেমে যাবে। যদি তিনি গতি বন্ধ করে স্থির হন তা হলে আজ বলে কিছু থাকবে না, রাত্রি থাকবে না, দিন থাকবে না, উষার প্রকাশ ও হবে না। (ব্যুচ্ছয়ং—উষসঃ প্রাদুর্ভাবঃ—সায়ন)

কালের গতি রুদ্ধ হ'লে যে অবস্থা হবে তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।"

রবীন্দ্রনাথের গতি সম্পর্কিত চিন্তা এবং গতিবাদের কাব্যিক রূপায়ণ ভারতীয় চিন্তাধারারই উত্তরাধিকার।

বেদ-উপনিষদের গতিতত্ত্ব যে রবীন্দ্র-চিত্তকে প্রভাবিত করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কবির গতিতত্ত্ব যে ভারতীয় চিন্তাধারারই অনুসৃতি তার প্রমাণ মিলবে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক উদ্ধৃত কবির উক্তি গুলিতে।

---

১ অথর্ব বেদ—১১।৬.২১।

"আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমরা জন্মান্তর বাদী। এ দেশে গতির ইঙ্গিতই সর্বত্র। মৃত্যু আমাদের শাশ্বত গতিপথের দ্বার খুলে দেয়। যে চলতে চায় না, তাকেও মৃত্যু লোক-লোকান্তরে ঠেলে নিয়ে যায়।"১

"আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে। এখন হয়ত সবাই বলবেন, এই ডাকটি আমরা পশ্চিমের মনীষীদের কাছে ছাড়া আর কোথাও পেতে পারিনে। কিন্তু আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন থেকেই আমি গতির জন্য পাগল। পরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় হয়ত সেই ভিতরের ডাকটি আর কিছু শক্তি লাভ করেছে, কিন্তু আসলে সেই আগে চলার ব্যাকুলতাটী আমাদের জন্মগত জিনিস। এখন দেখছি এটা আমাদের প্রাচীন মনীষীদের চিরদিনের বাণী।"২

"প্রতিদিনই দেখছি বীজ থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর হতে বৃক্ষে, বৃক্ষ হতে ফুলে, ফুল হতে ফলে, ফল হতে বীজে ক্রমাগতই চলচে প্রাণের যাত্রা। জীবনে মরণে সর্বভাবে আমরা গতি ও যাত্রারই লীলা দেখছি। কাজেই আমাদের গতির প্রতি শ্রদ্ধা আসা কিছু অদ্ভুত কথা নয়। তারপর এই যুগেও পাশ্চাত্য নানা চিন্তা ও আমাদের মনকে ক্রমাগত নাড়া দিচ্ছে। তবে দেখা যাচ্চে আমাদের দেশেও গতির তাগিদ কোনদিন কম ছিল না। আমাদের দেশেই তার আদি স্থান।"৩

"মোট কথা গতিই আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা। বলাকাতেও সেই গতিরই জয় গান করা হয়েছে।"৪

আচার্য সেন লিখিত কবিকৃত উক্তি গুলি আর কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে পাশ্চাত্য মনীষীদের গতিতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর গতিতত্ত্ব ভারতের যুগযুগান্তের সাধনালব্ধ সুমহান্ ঐতিহ্যেরই নব রূপায়ণ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গতিবেগ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, —নিজের জীবনে তার স্পন্দন ও অনুভব করেছেন, নিজের অনন্তকাল চলার

১ নিবেদন,—বলাকা কাব্য পরিক্রমা।
২ ঐ ঐ
৩ ঐ ঐ
৪ গ্রন্থভূমিকা—ঐ।

কথাও বারংবার ব্যক্ত করেছেন, চলা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই, এ কথাও বার বার বলেছেন। কবির অন্তরতম জীবন-দেবতা যিনি অসীম, অনন্তভূমা বিশ্বদেবতায় পরিণত,—তিনিও গতিশীলা—চঞ্চল গামিনী।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

* * * *

দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী। [১]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর গতি সার্থক হয় তখনই যখন সে পায় পূর্ণের পরশ। গতির সার্থকতা পূর্ণের মধ্যে আত্ম বিসর্জনে—এ তত্ত্ব ভারতীয় মনীষা সাধনার দ্বারা লাভ করেছে বহু শতাব্দী পূর্বে। অথর্ববেদ বলছেন :

পূর্ণকুম্ভোধিকাল আহিতস্তং পশ্যামো বহুধা নু সন্তঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনানি প্রত্যং কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্‌॥[২]

সর্বব্যাপ্ত (দিন-রাত্রি-মাস-বর্ষরূপে নিত্য অনবচ্ছিন্ন) কাল কুম্ভের ন্যায় পূর্ণ। সেই কালকে আমরা সৎপুরুষগণ দিনরাত্রি ভেদে অনুভব করি (অথবা পরমাত্ম, স্বরূপ কালকে শ্রবণ মননাদির দ্বারা সাক্ষাৎ করি)। সেই কাল (আত্মস্বরূপ) এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-ভুবন ব্যাপ্ত ক'রে (প্রত্যঙ্‌) আছেন। বিজ্ঞব্যক্তি বলেন, সেই কাল উৎকৃষ্ট (সুখ-দুঃখ রহিত) আকাশে পরমানন্দরূপে স্বস্বরূপে বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের কাল ও স্বয়ং পূর্ণ। সেখানে পৌঁছে তবে গতির চরিতার্থতা।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।[৩]

১ চিত্রা—চিত্রা।
২ অথর্ব—১৯।৫৩।৩।
৩ বলাকা—৮।

কবি বলছেন, "কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি পরিণাম কোথাও নেই। এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থাকতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।"[১]

কবির যুগ-যুগান্তের চলা সে ত পূর্ণস্বরূপ কালকে জানার এবং পাওয়ার আনন্দেই। কবি বলেন:

কতই নামে ডেকেছি যে
কতই ছবি এঁকেছি যে
কোন আনন্দে চলেছি তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।[২]

কখনও কবির অনুভবে কালের সীমা হারিয়ে যায় কালপ্রবাহের অনন্ত পারাবারে কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা,
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তি হারা শূন্যসিন্ধু, শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অনন্ত কালিমা—
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু পারাবার।[৩]

ঠিক এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোকে:

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্ত সংযমাঃ ॥[৪]

—হে দ্বিজ, কালরূপী ভগবান অনাদি—তাঁর অন্তও নেই। এই কালে সৃষ্টি স্থিতি লয় অব্যুচ্ছিন্ন—অর্থাৎ প্রবাহরূপে অবিরত চলেছে।

১ পাওয়া—শান্তিনিকেতন।
২ গীতাঞ্জলি—৬৫।
৩ মরণ স্বপ্ন—মানসী।
৪ বিষ্ণু পুরাণ—২।২৩।

ঋষির ঈশ্বর ও ত পরিপূর্ণ নিত্য—মহাকালের অনুরূপ।

"তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না যে সেখানে গতির সংস্রব নেই॥ সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাটতে চায়; কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্।"[১]

"এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহ-তারা-নক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না, সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমা গতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি; সূর্যেরও গতি।............

তাই আমি বলছি, আমার পরমা গতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমা গতি আছেন।......আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমা গতি তিনি হচ্ছেন এবং এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়—এই-যে এইখানেই।

সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে শুব্ধ করে রেখেছি। সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পূর্ণতার আদর্শকে সর্বত্রই অনুভব করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে।"[৩]

অন্যত্র লিখেছেন, "ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল।"[৪] রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রামায়ণের রামচন্দ্র পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক। বাস্তবিকই ভারতবর্ষের সাধনা পরিপূর্ণতারই সাধনা।

১ ওঁ—শান্তিনিকেতন।

২ প্রার্থনা—শান্তিনিকেতন।

৩ রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য।

৪ বিশ্ববোধ—শান্তিনিকেতন।

উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন পূর্ণস্বরূপ—পুরাণ ও তন্ত্রের দেবদেবীরাও তেমনি সীমার বাঁধনে বদ্ধ অসীম, পূর্ণকায়; রামায়ণের রামচন্দ্র এবং মহাভারতের তথা গীতার শ্রীকৃষ্ণ তেমনি পূর্ণতার প্রতিমূর্তি। রবীন্দ্রনাথের কাল যে পূর্ণস্বরূপ হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা ঋষির চিরদিনের কামনা:

অসতো মা সদ্গময়,
তমসোমাজ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।[১]

রবীন্দ্রনাথের যাত্রা ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে—অল্প থেকে ভূমায়, যা ক্ষুদ্র, যা স্বল্প—তা সংকীর্ণ তাতে কবি-চিত্ত তুষ্ট হ'তে পারে না কখনও। কবির স্বদেশপ্রেম তাই বৃহতের সংস্পর্শে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়, স্বজাতি-প্রীতি বিশ্বমানবতায় সার্থকতা পায়, 'জীবন দেবতা' পরিণত হন বিশ্বদেবতায়। শ্রুতি বলেন,

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"[২]

ভূমা এবং অল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রুতি বলেছেন, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি তদল্পং—যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।"[৩]

—যৎ স্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই—অর্থাৎ কোন প্রকারের ভেদ ব্যবহারের উপযোগ নাই,—সেই স্বরূপই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম। আর যাহাতে যৎস্বরূপে অন্য দর্শন হয়, ভেদ দর্শন বা নানা জ্ঞান হয় অর্থাৎ বহু অনাত্ম পদার্থ দৃষ্ট শ্রুত ও বিজ্ঞাত হয়, তাহা ভূমা নহে, তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর বা নিত্য, আর যাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন তাহাই মর্ত্ত্য নশ্বর বা অনিত্য।"[৪]

ভূমার পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিরদিন। ছোট জীবনের মোহ ত্যাগ করে বড় জীবনকে লাভ করতে তিনি সতত ব্যাকুল।

---

১ বৃহদারণ্যক—১।৩।২৮

২ ছান্দোগ্য ৭ অ, ২৩ খঃ।

৩ ঐ ৭ অ, ২৪ খঃ।

৪ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে
আম্রবন ছায়ে
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।[১]

ভূমাকে পরিত্যাগ ক'রে অল্পে যিনি থাকেন তুষ্ট,—বৃহৎ জগৎ ত্যাগ ক'রে আপনার সংকীর্ণ-স্বার্থকে আশ্রয় করেন তাঁর জীবন মূল্যহীন গতিহীন,—তেমন জীবন মৃত্যুর সামিল।

বলো মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে করি না শংকা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব
তার কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।[২]

১ দুরন্ত আশা—মানসী। ২ এবার ফিরাও মোরে,—চিত্রা।

ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত উপেক্ষা করে বৃহতের প্রতি কবির যে যাত্রা—সে যাত্রায় সঙ্গী না পেলে কবি একাই চলবেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।"—এই কবির জীবনের মন্ত্র। চলার পথে যদি আসে ক্লান্তি, যদি মনে জাগে সংশয়—ভয়, তবে কবি নিজেকেই নিজে প্রেরণা দেন এগিয়ে চলতে, "ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।"[১]

কল্পনার বর্ষশেষ কবিতায় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন থেকে বৃহত্তর জীবনে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় কবি বর্ষশেষের ঝড়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে,—যাতে যুগযুগান্তের বিরাট স্বরূপ কবি উপলব্ধি করতে পারেন।

যে পথে অনন্ত লোক চ'লয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।
শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্ধ্বে ল'য়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

কবি তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন জীবনের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ভুলে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে আগুয়ান হতে।

আন্ রে টেনে বাঁধা পথের শেষে
বিবাগী কর অবোধপানে
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি, আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে।
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি পড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।[২]

---

১ দুঃসময়,—কল্পনা। ২ বলাকা—১।

কবি নিজেও ভূমার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য কঠিন শপথ গ্রহণ করেছেন।

চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্‌,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি'—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।[১]

দূরের আহ্বান—ভূমার ডাক বারে বারে কবির কাছে আসে,—কবিকে হাতছানি দেয় নূতন। কবি চিরদিনই এগিয়ে চলেন নূতন নূতন যাত্রাপথে, সেই সুদূরকে, সেই বৃহৎকে, সেই ভূমাকে লাভ করবার জন্য।

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী
দিন চলে যায়, আমি আপন মনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রয়োজনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার পিয়াসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল করা বাঁশরি।
বক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যাই যে পাশরি।[২]

ভূমার সঙ্গে যোগের কথা কবি গদ্যেও ব্যক্ত করেছেন নানা স্থানে। "প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি। যিনি সকল সত্তার আত্মীয়, সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, তাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে

১। বর্ষশেষ—কল্পনা।
২। বিচিত্র—৬৫।

বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে—বলে উঠছে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, যাতে কোন প্রয়োজন নেই, তাও আনন্দের টানে টানবে এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্ম-ত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।"[১]

সীমার মধ্যে অসীমের অনুভবের মতই ক্ষুদ্রের মধ্যেও ভূমার প্রকাশ কবি উপলব্ধি করেছেন। দেশ—কাল—সমাজ—মানুষ সর্বত্রই সেই ভূমার অভিপ্রকাশ।

"এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না ; সেইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত সেখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন।

······কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এই জন্যই 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞা-সিতব্যঃ'। ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ আনন্দরূপমমৃতং—আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে।"[২]

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে ভূমার স্পর্শ পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কবিও ভূমানন্দের মাঝে তাঁর জীবনের আনন্দকে মিশিয়ে দিয়ে সার্থক করে তুলেছেন তাঁর জীবন সাধনাকে—তাঁর গতি পেয়েছে পূর্ণতার প্রসাদ। শেষ জীবনের কাব্যগুলি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রচুর।

এই ভূমার পথে কবি মানসের অভিসার এবং ভূমাকে লাভ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সীমা ও অসীমের মিলনতত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করা চলে। যিনি ভূমা তিনি বিরাট অসীম—, অসীম আকাশের তুল্য।

---

১ আত্মপরিচয়—৪

২ একটি মন্ত্র—শান্তিনিকেতন।

শ্রুতি বলছেন :

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম,—তদমৃতং স আত্মেতি।"[১]

—আকাশ নামক পদার্থ যা জগদ্রূপ এবং নামরূপের নির্বাহক,—নামরূপ যার সঙ্গে অভিন্ন—অথবা যার অন্তরালে বিরাজ করে, সেই বস্তুই ব্রহ্ম—সেই অমৃত—সেই আত্মা।[২]

আত্মস্বরূপ আকাশের সঙ্গে অর্থাৎ ভূমার সঙ্গে নামরূপ সংশ্লিষ্ট,—অর্থাৎ ভূমার সঙ্গে স্বল্পের যোগ অবিচ্ছিন্ন,—সীমার সঙ্গে অসীমের। সীমা থেকে অসীমে,—অল্প থেকে ভূমায়,—নীড় থেকে আকাশে যাওয়ার সাধনাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনা ও অল্প থেকে ভূমায় উত্তরণের সাধনা।

১। ছান্দোগ্য—৮ ১৪।

২। অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

নবম অধ্যায়

আনন্দবাদ

রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন বৈদিক ঋষির মতই যে ভূমা আনন্দময়,—অমৃতময়। উপনিষদের মন্ত্রে গভীর ভাবে আস্থাশীল কবির কাছে আনন্দময়ের প্রকাশক্ষেত্র অথবা লীলাস্থল এই জগৎ ও আনন্দের আগার। তাই জগতের সকল দ্রব্যই তাঁর কাছে আনন্দ-দায়ক।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।[1]
কে তুমি কর্কশকণ্ঠ তুলিছ ভয়ের
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।[2]
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি-শশী অঞ্জলি ভরিয়া
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি।
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে[3]

আনন্দময়ের উপাসনাই রবীন্দ্র কাব্যের মূল কথা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই কবির চক্ষে আনন্দময়ের আনন্দে উদ্ভাসিত। শ্রুতি বলেছেন, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"[4]

—আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। এই সকল ভূত আনন্দ হইতেই জন্মিতেছে—আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে—আবার অন্তকালেও আনন্দে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হয়।[5]

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।"[6]

১। নৈবেদ্য—৩০।
২। চৈতালী—অভয়।
৩। পূজা—৩২৬।
৪। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—অনুবাক ৬।
৫। অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৬। তৈত্তিরীয় ৭ম অনুবাক।

তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সকল সেই রস বা আনন্দ লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। সেই পূর্ণানন্দ যদি না থাকিত তাহলে কে-ই বা প্রাণকার্য করিত, আর কে-ই বা জীবিত থাকিত। সেই আনন্দই জীবকে আনন্দিত রাখে।[১]

ভৃগুপুত্র বরুণ ঋষি পিতার নিয়োগে তপস্যা দ্বারা প্রথমে অন্ন, পরে প্রাণ, মন বিজ্ঞান ও শেষে আনন্দকেই ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন।

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।[২]

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ।"[৩]

—আনন্দরূপ ব্রহ্মকে জানলে কোথাও থেকে ভয় থাকে না।

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"—যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে—, সবই আনন্দ স্বরূপ—অমৃত স্বরূপ।

"আনন্দ আত্মা"[৪]—আত্মাই আনন্দস্বরূপ।

"এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোমৃতঃ।"—

এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ"।—এই সমস্তই ব্রহ্ম এবং অমৃত।

রবীন্দ্রনাথও ঋষির মতই ঈশ্বরকে আনন্দময় জ্ঞানে উপাসনা করেছেন।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম
অপূর্ব-শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপ-তাপিত জন সবে চলো
সকল দুঃখ হবে মোচন।[৫]

অমৃতময় আনন্দময়ের আনন্দ নির্ঝর বিশ্ব প্লাবিত করছে। দিকে দিকে

১ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ
২ ভৃগূপনিষৎ— ৬।
৩ তৈত্তিরীয়—অনুবাক ৪।
৪ ঐ — ঐ ৫।
৫ গান।

সেই আনন্দ নব নব রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্ব-প্রকৃতিতে—কবি আনন্দ ছাড়া কিছুই দেখেন নি।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা ক'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে
দহে না সংসার তাপ সংসার মাঝারে রয়ে।[১]

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।[২]

আনন্দ আলয় এ মধুর ভব
হেথা আমি আছি একী স্নেহ তব;
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।[৩]
আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্লবন,
মধুর বিহগ কলধ্বনি।[৪]

কবির নিজের পাঞ্চভৌতিক দেহখানিও আনন্দময়ের অংশ সম্ভূত,—তাই আনন্দে পূর্ণ।

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।[৫]

১ গীতবিতান।
২ ব্রহ্মসঙ্গীত—৬।
৩ ব্রহ্মসঙ্গীত—
৪ ঐ —৪ ৫ গীতিমাল্য দেহ।

আনন্দময়ের অন্তহীন আনন্দকে লাভ করবার জন্য কবি ব্যগ্র।

পূর্ণ আনন্দপূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো

এসো মনোরঞ্জন।[১]

রবীন্দ্রনাথ সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী। যা সত্য তাই শিব—তাই কল্যাণকর—তাই সুন্দর। যা সুন্দর তাই আনন্দময়—চিরসুন্দরের আনন্দে পূর্ণ। পরম আনন্দময় আত্মার লীলা সর্বত্র। তাই কবির চক্ষে জগৎ এত সুন্দর এত আনন্দের। তাই কবি জগৎ ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্য সাধনে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কবি লিখেছেন, "আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। একথা আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, বাঁচে—আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।...যাহা কিছু সমস্তই পূর্ণ আনন্দের দিকে চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলায় মুখ থুবড়াইয়া মরিবার জন্য নহে।"[২]

"হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিঃশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয় উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।"[৩]

"যখন সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা সৌন্দর্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"[৪]

"কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেই তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, "নহে নহে এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে—এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।"[৫]

১ ব্রহ্মসঙ্গীত—২।
২ কবির কৈফিয়ৎ—সাহিত্যের পথে।
৩ ধর্ম।
৪ ঐ।
৫ পথের সঞ্চয়।

"নানা ছন্দে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানাদিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতি কাব্য প্রকাশ হয় না যে।"[১]

পৃথিবীকে সৌন্দর্য ও আনন্দের বলে জেনেছেন বলে পৃথিবীর রূঢ় বাস্তব দিকটিকে কবি যে উপেক্ষা করেছেন, তা নয়। জগৎ যে অসীম আনন্দেরই সীমায়িত প্রকাশ। তাই কবির দৃষ্টিতে দুঃখও আনন্দ, কারণ আনন্দের ওপিঠেই যে দুঃখ, দুঃখ আছে বলেই ত আনন্দের স্বরূপ বুঝতে পারি। "এই (আনন্দ) যদি উপনিষদের চরম কথা হয়, তবে কি ঋষি বলতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই। আমরা তো ঐ গুলোর উপরেই বেশী করিয়া জোর চাই, নইলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন,—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ। কেই বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত (অর্থাৎ কেই বা দুঃখ ধন্দা স্বীকার করিত) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই দুঃখ দ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয় দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ।"[২]

স্পষ্টতঃই কবি স্বীকার করেছেন যে উপনিষদের আনন্দবাদ তাঁর অন্তরকে আনন্দময় করে তুলেছে বলেই তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে আনন্দময় ঈশ্বরের অভিপ্রকাশ বলেই ত বিশ্ব আনন্দের আগার। "বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ; কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।"[৩]

ঋগ্বেদের ঋষির মত তিনি বিশ্বকে মধুময় ব'লে অনুভব করেছেন।

---

১ শান্তিনিকেতন।

২ কবির কৈফিয়ৎ—সাহিত্যের পথে।

৩ মুক্তি—শান্তিনিকেতন।

তাই ভাল মন্দ মিশিয়ে যে জগৎ তাকে কবি প্রণতি জানিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।
মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিত কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বামহাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলা ক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে,
* * * *
হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।[১]

কবির চক্ষে যা সুন্দর তাই আনন্দময়। কারণ অসীমের আনন্দ সীমায় ধরা পড়েছে। সুন্দরের পুজারী তাই সত্য শিব তথা আনন্দের পুজারী হ'য়ে ওঠেন।

"যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট, তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘর ছাড়া করিয়া দেয়।"[২]

সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসনায় আনন্দে বিভোর হ'য়ে যান—ব্রহ্মানন্দের স্বাদ লাভ করেন,—জীবনকে ধন্যজ্ঞান করেন আনন্দময়ের আনন্দ স্পর্শ পেয়ে।

১ পত্রপুট—তিন।
২ জীবনস্মৃতি।

অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ
ঊষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ ;[১]
জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল; ধন্য হল, মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।[২]

তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে
ছিলে আমার খেলায়
আনন্দে তাই ভুলেছিলাম
কেটেছে দিন হেলায়।[৩]

প্রেমে প্রাণে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।[৪]

কবির জীবনের সকল আনন্দ ভূমানন্দের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে যায় আনন্দ-ময়ের আনন্দ সার্থক হয় কবির আনন্দে।

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে ॥[৫]

১ বর্ষশেষ—পরিশেষ।
২ গীতাঞ্জলি—৪৪।
৩ গীতিমাল্য।
৪ গীতাঞ্জলি—৬।
৫ গীতাঞ্জলি—১২১।

রূপের সাগরেই ত অরূপরতন রয়েছেন। তাই কবি রূপ সাগরেই ডুব দিলেন।

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।[১]

রূপের মাঝারে অরূপকে লাভ ক'রে কবির হৃদয় দেহ মন ভরে ওঠে।

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে।
ভুবন আমার ভরিল সুরে
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে।[২]

সুন্দরের মধ্যেই আনন্দের অবস্থিতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আধুনিক কবি বলিয়াছেন, 'Truth is beauty beauty truth'—আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে ট্রুথ এবং বিউটি মূর্তিমতী। উপনিষদও বলিতেছেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ—অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।"[৩]

যেখানে সুন্দর সেখানেই আনন্দ। সুন্দর আর আনন্দ অভিন্ন। সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, "গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্রের উল্লাসকে একটি মাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিশাইয়া রহিয়াছে। এই যে একদিকে ফুটিয়া পড়া আর একদিকে আঁটিয়া ধরা, ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দর্য; বিশ্বের মধ্যে এই ছাড় দেওয়া এবং টান রাখার নিত্যলীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছেন।[৪]

১ গীতাঞ্জলি—৪৭।
২ পূজা—৩৪৭।
৩ সাহিত্য—সৌন্দর্যবোধ।
৪ সাহিত্য—সৌন্দর্যও সাহিত্য।

"আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের জগৎ করিয়া তুলিতেছে—সেই দিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে—কর্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য।"[১]

[১] সাহিত্য—সৌন্দর্য ও সাহিত্য।

দশম অধ্যায়

সৌন্দর্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব উপনিষদের আত্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত—একথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরমাত্মার আনন্দরূপ পৃথিবীতে সুন্দর রূপ ধরেছে, একথা যেমন কবি বিশ্বাস করেন, তেমনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের আত্মা সুন্দরকে সৃষ্টি করে বলেই বস্তু সুন্দর হ'য়ে ওঠে। সেইজন্যই একই বস্তু কারো কাছে সুন্দর, কারো কাছে অসুন্দর। আত্মা সুন্দর দেখে বলেই সুন্দর হ'য়ে ওঠে পৃথিবীর বস্তু নিচয়। "ঐ যে আমরা তাহাকে সৌন্দর্য বলি, সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি।"[১]

আমারি চেতনার রঙে পান্না হ'লো সবুজ
চুনী উঠলো রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠলো আলো
পুবে পশ্চিমে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'
সুন্দর হ'লো সে।[২]

এই কথাই কবি আর একস্থানে লিখেছেন, "সুন্দর কাকে বলি? বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি আন্তরিক অর্থ, তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর, যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না বোঁটা না, একটা আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।"[৩]

উপনিষদের আত্মতত্ত্ব এবং আনন্দবাদের প্রভাব কবির রচনায় সর্বত্র। আনন্দময়ের আনন্দ যে সুন্দরের রূপ নিয়েছে সেই সুন্দরের উপাসনাতে কবি জীবন কাটিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যেও অনির্বচনীয় সৌন্দর্য তথা আনন্দের

১ পঞ্চভূত—সৌন্দর্যের সম্বন্ধ।

২ শ্যামলী—আমি।

৩ মানুষের ধর্ম।

সৃষ্টি ক'রে গেছেন সমস্ত জীবন ভোর। সাহিত্য তাঁর মতে আনন্দেরই প্রকাশ। তাই সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যাতে ও তিনি আনন্দবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অসীমের আনন্দ সীমাবদ্ধ হ'য়ে প্রকাশিত হয় সাহিত্যে। কবি বলেন, সাহিত্য হ'লো 'অপ্রয়োজনের আনন্দ'। শুধু সাহিত্য কেন, চারুশিল্পও 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' থেকে জাত। কবি লিখেছেন, "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ আকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়া সামগ্রীকে জাগ্রত ক'রে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।"[১]

"সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্র অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনিই রস, এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।"[২]

সাহিত্য রসস্বরূপ ভূমানন্দকে প্রকাশ করে,—উপলব্ধি করায়—তাই সাহিত্য সুন্দর, রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এক কথায় সাহিত্য হচ্ছে—

অকাজের কাজ যত
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়
আনন্দের আয়োজন।[৩]

সৌন্দর্যের পুজারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বত্র সকল সৌন্দর্যের আধার,—সকল আনন্দের উৎস সেই একের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন, ব্যক্ত করেছেন। তিনি অখণ্ড চৈতন্য—অসীম—পরিপূর্ণ। ভালো মন্দ, ছোট বড়, খণ্ড-অখণ্ড সব নিয়ে পূর্ণতা। যা পূর্ণ তাই সুন্দরতম। যা খণ্ড তা পূর্ণেরই অংশ—তাই খণ্ড সুন্দর। কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্যের সার্থকতা পূর্ণ সৌন্দর্যে মিশে যাওয়ায়।

"জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি ততই জানিতে

১ সাহিত্যতত্ত্ব,—সাহিত্যের পথে।
২ সৌন্দর্যবোধ—সাহিত্য।
৩ আবেদন—চিত্রা।

পারি, ভালো মন্দ সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্ব সঙ্গীতের ছন্দ রচনা করিতেছে—সমগ্র ভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই। সৌন্দর্যের কোথাও লাঘব নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্য-বোধের শেষ লক্ষ্য।"[১]

সীমা ও অসীম মিলে যেমন এক অদ্বয় অনন্ত সত্তা, তেমনি খণ্ড ক্ষুদ্র পূর্ণ বৃহৎ মিলে এক অখণ্ড সৌন্দর্য প্রবাহ। বস্তু নিরপেক্ষ এই অনন্ত সৌন্দর্যের জয়গান চিত্রার 'বিজয়িনী', 'উর্বশী', 'আবেদন', 'পুর্ণিমা' প্রভৃতি কবিতায়। 'উর্বশী' 'কবিতায়' নিরাকার অনাদি অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্যমূর্তির বন্দনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দন বাসিনী উর্বশী।

উর্বশীর নেই আদি, নেই অন্ত, জন্ম নেই, বাল্য নেই, কৈশোর নেই। নিরাকার সৌন্দর্য মূর্তি চিরকালই সম্পূর্ণ, চিরদিনই পূর্ণ-বিকশিত। উর্বশী অনন্ত-যৌবনা।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।

অখণ্ড সৌন্দর্য ভালো মন্দ নিয়েই গঠিত ; খণ্ডতা অখণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত।

আদিম বসন্ত-প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষ ভাণ্ড লয়ে বাম করে।

এই সৌন্দর্যমূর্তি জগতের চির-আরাধ্য—একে লাভ করার জন্যই কবির 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। কিন্তু এ সহজলভ্য নয়। মানুষকে সে প্রলুব্ধ করে, চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে কিন্তু ধরা দেয় না সহজে। তাই জগৎ কাঁদে তার বিরহে।

ওই শুন দিশে দিশে কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।

অজিতকুমার চক্রবর্তী উর্বশী ও বিজয়িনী কবিতা দুটি সম্পর্কে লিখেছেন, "উর্বশী এবং বিজয়িনী যে দুটি কবিতা চিত্রায় আছে তাহার মধ্যে সৌন্দর্যকে

১ সৌন্দর্যও সাহিত্য,—সাহিত্য।

* সমস্ত মানব সম্পর্কের বিকার হইতে সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার অখণ্ডতার উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।............

জগতের বিচিত্র চঞ্চল সৌন্দর্য যে সকল সম্বন্ধাতীত এক অখণ্ড সৌন্দর্যে নিবিড় লীন, উর্বশীর একথাও জীবন দেবতার ভাবের অন্তর্গত।.........

সৌন্দর্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা। জগতের কোন রহস্য সমূদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্ব সৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎ চঞ্চল আঁচল দোলানোর আভাস পাওয়া যাইতেছে।

তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল।.........ইহারই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল কম্পিত, ইহারই স্তনহার চ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ব-বাসনার বিকশিত পদ্মের উপরে ইহার অতুলনীয় পাদপদ্ম স্থাপিত।.........উর্বশী সেই সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি।"

রবিরশ্মির স্বরূপ ব্যাখ্যাতা ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ। যে সৌন্দর্য Absolute, যাহা Essential Beauty যাহা অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড সৌন্দর্য,—যাহা spirit of beauty যাহা সমস্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও বাহিরে, তাহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তামাত্র।......ইহা বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের স্তুতি—যাহা ভোগাতীত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত—যাহা অনির্বচনীয়, যাহার কোনও মূর্তি নাই, এবং যাহার কোনও বন্ধন বা সম্বন্ধ নাই, এবং যাহা কোন স্থূল বাস্তব পদার্থ নহে, সেই অবিশেষণযোগ্য বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রাণীকে বলা হইয়াছে উর্বশী। পূর্ণা সৌন্দর্য-দেবী নিজে নিজের জননী, তিনি প্রথম হইতেই পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।.........

যিনি সত্য শিব সুন্দর ভগবান, তিনি সকল সম্বন্ধাতীত অথচ সর্বগত; পুরাকালে ঋষিরা তাই বলিতেন—সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তাঁহারা জড়ের ও ও রূপের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞান ঘোষণা করিতেছে—জড়ই সব, ব্রহ্মতত্ত্ব মানুষের কল্পনামাত্র। সে কল্পনার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে,

---

১ রবীন্দ্রনাথ—৩।

সে যুগ আর ফিরিবে না—'ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব শশী, অস্তাচল বাসিনী উর্বশী।'

কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা এই কথায় মেটে না—'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে।'[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটি আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে এবং বিশদ করছে। অখিল রসমূর্তি আনন্দ স্বরূপ পরম সুন্দর অখণ্ড চৈতন্যই যে বিগ্রহবতী শ্রীমূর্তি সৌন্দর্য-দেবী রূপে বন্দিতা হয়েছেন উর্বশী ও বিজয়িনী কবিতাদ্বয়ে সে বিষয়ে আর সংশয়ের হেতু নেই।

ঋগ্বেদের উষা বর্ণনা এবং সম্বাদ সূক্তের উর্বশী এই কবিতায় ছায়া ফেলেছে তাতে ও সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদে পুরূরবা উর্বশীকে বলছেন:

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈনু।[২]

—হে পত্নি! তোমার চিত্ত অতি নিষ্ঠুর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমাদের কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

উর্বশী—

কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামশিয়েব।[৩]
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি॥

—তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে কি হবে? আমি প্রথম উষার মত চলে এসেছি। হে পুরূরবা, বাড়ী ফিরে যাও। বায়ুর মত আমি অধরা হয়েছি।

মানুষের কামনার বিষয়ীভূতা অখণ্ড সৌন্দর্যরূপা উর্বশী ভোগী মানুষের কাছ থেকে পলায়ন করে। কখনও হয়ত মানুষ চকিতে তার আভাষ পায়—সৌন্দর্য ধরা দেয় তার হাতে তারপরেই উর্বশী পলায়ন করে—মানুষ আক্ষেপ করে: "ধরা দিয়ে পালাইল সকল বাঞ্ছনা।[৪]

যদাসু মর্তো অমৃতাসু নিস্পৃক্ সং ক্ষোণীভির্ণ পৃংক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুংভত স্বা অশ্বাসোন ক্রীলয়ো দংদশানাঃ॥

১ রবিরশ্মি—চিত্রা,—উর্বশী।

২ ঋগ্বেদ— ১০।৯৫।১।

৩ ঐ ১০।৯৫।২

৪ পরশ পাথর—সোনারতরী

বিদ্যুন্ন যা পতংতী দবিদ্যোভরংতী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ু॥[১]

—পুরুরবা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোক বাসিনী অপ্সরা দিগের সঙ্গে যখন কথা কহিতে এবং তাহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটক দিগের ন্যায় পলায়ন করিল। যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু দান করুন।[২]

দেখা যাচ্ছে, উর্বশী মানুষের কামনার কাছে ধরা দিয়েও এক অমানুষী সৌন্দর্য মূর্তিররূপে মানুষের নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে। মানুষ অখণ্ড সৌন্দর্যকে ধরতে না পেরে কাঁদে—বিশ্ব বসুন্ধরা হাহাকার করতে থাকে। কিন্তু উর্বশী ফিরে আসে না। তবু মনের কোণে আশা জেগে থাকে। পুরুরবা আকুল হ'য়ে কামনা করেন:

অন্তরিক্ষ প্রাং বজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে॥[৩]

অত্যন্ত কামনাযুক্ত হ'য়ে আমি অন্তরীক্ষপূর্ণ-কারিণী আকাশ-প্রিয়া উর্বশীকে আহ্বান করি। আমার সমস্ত সুকৃতের ফল তোমার কাছে পৌছাক। হে উর্বশী ফিরে এসো, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে।

ঋগ্বেদের পুরুরবা উর্বশী সংবাদে উর্বশীর মানুষী ও অমানুষী মূর্তি কল্পনা এবং মানুষের কামনায় উর্বশীর সাময়িকভাবে ধরা দেওয়া আবার আকাশ ও অন্তরীক্ষ পূর্ণকারিণী অনন্ত সৌন্দর্যরূপিণী উর্বশীর অন্তর্ধান এবং পুরুরবার আকুল ক্রন্দন—এবং ফিরে আসার জন্য উর্বশীকে আহ্বান—রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কল্পনায় নিঃসন্দেহে ছায়া ফেলেছে। মনে হয় 'জীবন-দেবতা' কল্পনাতেও ঋগ্বেদের উর্বশী ছায়া ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই বস্তু নিরপেক্ষ অখণ্ড সৌন্দর্যমূর্তির বন্দনায় কবি বিহারীলাল

১ ঋগ্বেদ ১০।৯৫।৯—১০।
২ অনুবাদ—৺রমেশ চন্দ্র দত্ত।
৩ ঋগ্বেদ ১০।৯৫।১৭।

বন্দিতা সারদা এবং ইংরাজ কবি শেলীর 'sprit of Beauty' বন্দনার ছাপ ও দুর্লক্ষ্য নয়। "Hymn to Intellectual Beauty" কবিতায় সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর বন্দনায় Shelly লিখেছেন,

Spirit of Beauty, that thou consecrate
with thine own hues all thou dost shine upon
of human thought or form, where art thou gone ?

শেলীর সৌন্দর্য বন্দনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বন্দনার সাদৃশ্য চোখে পড়ে সহজেই। বিহারীলালের সারদার সঙ্গে shelly-র 'spirit of beauty-'র সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন।[1] তথাপি একথা মানতেই হবে যে অখণ্ড সৌন্দর্য মূর্তির পরিকল্পনায় ঋগ্বেদের উর্বশীর সঙ্গে উপনিষদের আনন্দময় জ্যোতির্ময় রসস্বরূপ চির সুন্দর এক অদ্বিতীয় অব্যয় ব্রহ্মচিন্তার প্রভাব কার্যকরী হয়েছে ;—বরঞ্চ এই প্রভাবই সকল প্রভাবের উর্ধ্বে জয়পতাকা উড়িয়েছে। এই নিরাকার ব্রহ্ম-স্বরূপ অখণ্ড সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয় জগতের সব বাসনা-কামনা। সকল কামনা বাসনার উর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই তাঁর নাগাল পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি সর্বব্যাপিনী হ'য়েও সুদুর্লভা। তাই এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের কাছে বিচূর্ণ হয়েছে মদনের দর্প

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গ দেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
সমর্পিল পদপ্রান্তে পুজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।[2]

১ আধুনিক সাহিত্যের বিহারীলাল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ বিজয়িনী—চিত্রা

একাদশ অধ্যায়

মৃত্যু ও ধ্বংস।

আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে এবং বিশ্বাতীত অসীমের মধ্যে আনন্দ-মূর্তির দর্শন পেয়েছেন বলেই ঋষির মত লাভ করেছেন অতিক্রান্ত দর্শন ;—তাই ঋষির মতই অস্বীকার করেছেন মৃত্যুকে। মৃত্যুর সত্যস্বরূপ কবি-চক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন, মৃত্যুর অর্থ অবসান নয়,—মৃত্যুর অর্থ আনন্দ-স্বরূপকে পরিপূর্ণ ক'রে পাওয়া।

পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কি হবে
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা ভুলিয়া যাই।

*　　　*　　　*

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে
চিরজনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চেনাবে সবে।[১]

জীবনে মরণে লীলা করছেন একই লীলাময় সত্তা। কবি তাই বললেন,

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মৃত্যুর উৎসবে যোগ দেওয়া আনন্দোৎসবে যোগ দেওয়ার সমতুল্য। ধরণীতে এত সৌন্দর্যের বিচিত্র আয়োজন মরণের আনন্দেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। মরণই সার্থক করে তোলে সকল সৌন্দর্য-সম্ভারকে।

"মৃত্যু বড়ো সুন্দর, বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন ; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে ; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের

১ গীতাঞ্জলি—৩।

২ গীতালি—২৮।

মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে ; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ স্থিতিকে বিচলিত করে।[১]

প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।[২]

মৃত্যুর মাঝে লুকিয়ে আছেন অমৃত। মানুষের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই সত্য অজ্ঞাত। কিন্তু কবি উপলব্ধি করেছেন সেই সত্য, মরণের যথার্থ স্বরূপ।

মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছো ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমর পুরী
ধুলা অসুর করবে চুরি
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছো ?
হেনেছি [৩]।

মৃত্যুর সত্যস্বরূপ অধিগত বলেই কবিচিত্ত যাত্রার আনন্দে পূর্ণ।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি
গান গায় চন্দ্রতারা রবি।[৪]

আত্মা নিত্য, অবিনাশী। তাঁর নেই জন্ম, নেই মৃত্যু। এ বিশ্বাস ভারতবর্ষের নিত্যকালের। কবিও বিশ্বাস করেন, মৃত্যু বলে কোন কিছু নেই—যা মৃত্যু বলে প্রসিদ্ধ, তার অর্থ আত্মার বন্ধন মুক্তি, মানবাত্মাকে বিশ্বাত্মায় যুক্ত করে দেওয়া—সীমাকে অসীমের মাঝে মুক্ত করা। কবির দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ যে জীবন তা মৃত্যু তুল্য।

---

১ বর্ষশেষ—শান্তিনিকেতন।

২ গীতাঞ্জলি—৩৬।

৩ ফাল্গুনী।

৪ বলাকা—১৮।

"ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখ দুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে—কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে কত ইচ্ছা কত আশা মরছে—এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে।"[১]

কিন্তু এই ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে অসীমতার অভিমুখিনতাই আত্মার প্রসার—সীমা থেকে অসীমে যাত্রা।

"এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্ব-পরিধিতে পরিব্যাপ্ত,—আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম করে, তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না। তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত,—যে রূপ আনন্দময়—যা মৃত্যুহীন। সেই সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা।"[২]

আত্মার সঙ্গে বিশ্বের যোগ অবিচ্ছিন্ন। সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে—দেহকে ছাড়িয়ে বিশ্বের আত্মায় আত্মাকে যুক্ত করার জন্যই মানুষের সকল প্রয়াস। মৃত্যু সেই যোগকে সার্থক করে তোলে—অমৃতলাভ ঘটায়।

"সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্যদিয়া অমৃত।"[৩]

ঋষির মতই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের কল্যাণাত্মক রূপে বিশ্বাসী। পরম আনন্দময় ব্রহ্ম মঙ্গলময়, তিনি সত্য সুন্দর এবং শিব। জীবাত্মার কল্যাণই তাঁর কাম্য। কিন্তু জীবনে এবং জগতে দুঃখ আছে ব্যর্থতা আছে, হতাশা আছে—বিচ্ছেদ

১ মা মা হিংসীঃ, শান্তি নিকেতন।

২ সাহিত্যতত্ত্ব—সাহিত্যের পথে।

৩ আনন্দরূপ,—পথের সঞ্চয়।

আছে—মৃত্যু আছে। এদের ত অস্বীকার করবার উপায় নেই। দুঃখ অথবা মৃত্যুর মধ্যে কল্যাণ কোথায়? কবি বিশ্বাস করেন, মৃত্যু ধ্বংস, ব্যর্থতা, দুঃখ, —এরা সত্য নয়। এরা সত্য প্রকাশের সহায়ক —মঙ্গলের দ্বার। আঘাত-দুঃখ-মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে মঙ্গল লাভ করতে হয়। ধ্বংস আনে কল্যাণ, নবসৃষ্টি ;—দুঃখ আসে নিদ্রিত আত্মার উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে ;—মৃত্যু গায় নবজীবনের আগমনী।

"চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোন আশ্রয় পেত না,—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে প্রসন্ন মুখ। সেই সত্য হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে"।[১]

রুদ্র ধ্বংসের দেবতা। কিন্তু তাঁর ধ্বংসের উদ্দেশ্য কল্যাণ আনা। যিনি রুদ্র তিনিই শিব। বেদের ঋষি রুদ্রের সত্য পরিচয় পেয়েছেন শিবত্বে। তাই তাঁরা রুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন দক্ষিণ মুখ দ্বারা রক্ষা রক্ষা করতে, —প্রার্থনা জানিয়েছেন কল্যাণ সাধন করতে।

রবীন্দ্রনাথ রুদ্রের কল্যাণ-ময়ত্বে বিশ্বাসী। সকল দুঃখে সকল আঘাতে জীবনের সকল বিপর্যয়ে রুদ্রের শিবত্বে বিশ্বাস নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত আলো বিকিরণ করে কবি-চিত্তের জ্বালা প্রশমিত করেছে, কবিকে নীরবে সকল দুঃখ শোক সহ্য করবার শক্তি দিয়েছে এবং সকল দুঃখ দৈন্য থেকে মুক্তি দিয়ে কবির কাছে নব জীবনের দিশারী হয়েছে। এই বিশ্বাসই তাঁর সৃষ্টিকে আনন্দ জ্যোতিতে ভরিয়ে তুলেছে। অবিচলিত নিষ্ঠায় কবি ঈশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ করতে পেরেছেন এই বিশ্বাসের জোরেই ; কোন সংশয় তাঁর চিত্তকে দোলাচল করে নি কখনও। রুদ্রের শিবত্ব সম্পর্কে কবি আরও লিখেছেন, "আমাদের এক রঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জলজ্জটা কলাপ লইয়া দেখা দেয়, সেই ভয়ংকর প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাৎ, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখ মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড—কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে

১ আত্মপরিচয়—৩।

রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে,—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহা ধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারের মহাপুণ্য ও মহা পাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নয়ন যেন ধ্রুব জ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজন ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে—তখন তোমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের অক্ষেপে যেন রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সমস্ত ভালো এবং মন্দের মধ্যে তোমারি জয় হউক।

আমাদের এই খ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে,—সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে, ভালোকে মন্দকে উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া ওঠে।"[১]

শিব ও রুদ্র একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। রুদ্র ও শিব একই দেবতা। রুদ্রের পাশেই শিব—ধ্বংসের পাশে সৃষ্টি,—এ ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

প্রলয় নাচন নাচলে যখন
আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন
পড়ল খুলে।

১ আত্মপরিচয়—৩।

জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল
উঠল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল
আকাশ পারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী
ঘর ছাড়ারে।[১]

মোর সংসারে তাণ্ডব তব
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ মন্দ্র হে।[২]

রুদ্রের কল্যাণময় মূর্তির পরিচয় পাই তখনই যখন তিনি ভাঙ্গার পরে গড়েন,—ধ্বংসের পরে সূচনা হয় নব সৃষ্টির—মৃত্যুর পরে আসে নব জীবন।

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন
সহজ প্রবল
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে

১ তপতী
২ নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা।

তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।[১]

ফুলের মৃত্যুতে ফলের জন্ম,—পুরাতন পত্রপুট বৃক্ষচ্যুত হ'লে হয় নব পল্লবের উদ্‌গম। সৃষ্টির এ এক অদ্ভুত রহস্য। এই ভাবেই চিরকাল চলছে সৃষ্টিলীলা। দিনের পাশে রাত্রির মত জীবনের পাশে মৃত্যু চির দিনই রয়েছে।

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়,—
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরাময়।[২]

পুরাতন ধ্বংস হ'লে নূতনের অভ্যুদয় হবেই। তাই কবি নব-জন্মের আশায় শান্তভাবে এ দেহ ত্যাগ করবেন।

সহজে আমি মানিব অবসান
ভাবী শিশুর জনম মাঝে নিজেরে দিব দান
আজি রাতের যে ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিবে দুলি
ঝরুক তারা কালি রাতের
ফুলেরে দিতে প্রাণ।[৩]

কবি আর এক জায়গায় লিখেছেন, "হে রুদ্র পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথা ও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তারপরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম

১ বর্ষশেষ—কল্পনা।

২ রাহুর প্রেম—ছবি ও গান।

৩ মরণমাতা—বীথিকা।

পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদ সংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবন পথের সম্বল হয়ে থাক। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে, তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব, তখনই রক্ষা পাব।"[১]

জীবন আঁকড়ে ধ'রে মরণকে এড়িয়ে যেতে চাইলেই যে মৃত্যু আগে এসে আপন অধিকারের পরওয়ানা জারী করবে। ভীত না হ'য়ে বীরের মত মরতে পারলে অমৃতলাভ হবে।

মৃত্যু সাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ সাধন সাধবে।[২]

কবি উপলব্ধি করেছেন যে জন্ম ও মৃত্যু তাঁর অন্তরেই বাসা বেঁধেছে,—সদা নৃত্য করছে।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গ সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে—
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।[৩]

ধ্বংস বা মৃত্যু সম্পর্কে কবির এই যে উপলব্ধি তা যে ভারতবর্ষের বহু যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সে কথা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না।

১ প্রার্থনা—শান্তিনিকেতন।
২ বলাকা—৩।
৩ অরূপরতন

ঋগ্বেদের রুদ্র ধ্বংসের দেবতা, ভয়ংকরের দেবতা। "বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহারা জটাজুট অগ্নিশলাকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের নাম তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া বোমপথে বিক্ষিত ভাবে ছুটিতে থাকে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা জগতের শ্মশান; তাহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগ্‌হস্তীরা আর্তনাদ করিয়া ওঠে। তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্তশ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়, তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের বিনাশের ঝঞ্ঝা— তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, তাঁহার বিষাণবাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।"[১]

কিন্তু ঋগ্বেদের রুদ্র শুধু ধ্বংসের দেবতা নন। এই ভীষণ ভয়াল মূর্তির অন্তরালে মঙ্গলময় শিবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ঋষি। তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছেন রুদ্রদেবতার কাছে অভয়মন্ত্র—কল্যাণময়ী করুণা।

অশ্যামতে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য
তব রুদ্র মীঢ্বঃ।
সুম্নায়ন্নিদ্বি শো অস্মাকমাচারারিষ্টবীরা
জুহবাম তে হবিঃ॥[২]

—জ্ঞানবর্ষণশীল (মীঢ্ব) সংসারদুঃখবিনাশক (রুদ্র) হে দেব! সদ্ভাব জনক (ক্ষয়দ্বীরস্য) তোমার উপাসনার দ্বারা তোমার কল্যাণময়ী করুণাকে প্রার্থনা করিতেছে যেন কামাদি রিপুগণের (অরিষ্টবীরা) দ্বারা অহিংসিত হইয়া আমরা তোমার আহ্বান করি, তুমি আহ্বানকারী আমাদিগকে বুদ্ধি সকলে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করিতে আগমন কর।[৩]

ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে
নি হবামহে।
আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা
বৃণীমহে॥[৪]

১ বঙ্গভাষাও সাহিত্য,—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন
২ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৩।
৩ অনুবাদ ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৪ ঋগ্বেদ ১।১১৪।৪

—দ্যোতমান কর্ম-সাধক অতিমেধাবী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষি-স্বরূপ সংসার দুঃখবিনাশকারী রুদ্রদেবকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আমরা যেন আহ্বান করি; সেই দেব আমাদের প্রাক্তন কর্মরূপ অদৃষ্টবাদকে বা জন্মান্তর রূপ কর্মফলকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করুন; সংসার দুঃখ-বিনাশী দেবের নিকট হইতে এই কল্যাণময়ী করুণা আমরা সম্যগ্‌রূপে যাজ্ঞা করিতেছি।[১]

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আযৌ মা নো গোষু
মা নো অশ্বেষু রীরিষ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ
সদমিত্ত্বা হবামহে ॥[২]

—সংসার দুঃখ-বিনাশক হে দেব! আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদি বিষয়ে হিংসা করিও না; আমাদের মানবত্ব বিষয়ে হিংসা করিও না; আমাদিগের অধীন বিষয়ে হিংসা করিও না, অনুসরণ পরায়ণ হইয়া আমরা যেন আপনাকে আহ্বান করি।[৩]

ক্ব স্য তে রুদ্র মৃলয়াকু-
র্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।
অপহর্ভর্তা রূপসো দৈব্য-
স্যাভী নু মা বৃষভ চক্ষমীথাঃ ॥[৪]

—হে রুদ্র, তোমার সেই সুখকর হস্ত কোথায়, যে হস্তে আছে সুখকর ঔষধ—যে হস্ত সকল দৈব অমঙ্গল নাশক? হে বৃষভ, তুমি আমাকে একান্ত ভাবে ক্ষমা কর (অথবা সর্বত্র সমর্থ কর)।

উপনিষদের ঋষি ও রুদ্রের প্রসন্নতা কামনা করেছেন বারংবার।

যা তে রুদ্র শিবা তনূর ঘোরঽ পাপ কাশিনী
তয়া ন স্ত নু বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচকাশীহি ॥[৫]

—হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত (গিরিতে অর্থাৎ দেহে অবস্থান পূর্বক শং অর্থাৎ

১ অনুবাদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী। ২ ঋগ্বেদ—১।১১৪।৮
৩ ঐ— ঐ
৪ ঐ—২।৩৩।৭
৫ শ্বেতাশ্বর ৩।৫।

সুখ বিধান কারী), তোমার যাহা শুদ্ধ, আনন্দপ্রদ এবং পুণ্যাভিব্যঞ্জক তনু, সেই সুখতম তনু দ্বারা, আমাদের মঙ্গল কর।[১]

যমিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥[২]

—গিরিশন্ত, হে গিরিত্র (দেহে অবস্থান পূর্বক স্বভক্তের ত্রাতা), তুমি নিক্ষেপ করিবার যে বাণ হস্তে লইয়াছে, তাহাকে মঙ্গলময় কর। তুমি জগৎ এবং পুরুষকে হিংসা করিও না।[৩]

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত
মা ন উক্ষিতম্। মানো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং
প্রিয়া মা ন স্তনু রুদ্ররীরিষঃ ॥ মা ন স্তোকে তনয়ে
মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতোহবধীর্হবিষ্মন্তো নমসা বিধেম তে ॥[৪]

—হে রুদ্র! তুমি আমাদের গুরুজনদের প্রতি হিংসা কোরো না; বালক, যুবক, গর্ভস্থ শিশু, পিতা, মাতা এবং আমাদের প্রিয় বীরগণের প্রতি হিংসা কোরো না। হে রুদ্র! তুমি আমাদের পুত্র, যুবকপুত্র, আয়ু, গোধন ও অশ্বের প্রতি হিংসা কোরো না, জীবহত্যা কোনো না; আমরা হবিঃ দ্বারা তোমার পুজা করি।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন,

বিশ্বকর্মস্তনূপা অসি মা মোদোষিষ্টং
মা মা হিংস্টিমেষ বাং লোক ইতি।[৫]

—হে রুদ্র বিশ্বকর্মা, তুমি আমাদের দেহরক্ষক, তুমি আমাদের দগ্ধ কোরো না, হিংসা কোরো ন', এ জগৎ তোমারই।

উপনিষদ আরও বলছেন,

যা তে ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো মৃড় জীবসে ॥[৬]

১ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ। ২ শ্বেতাশ্বতর—৩।৬।
৩ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৪ নারায়ণোপনিষৎ—৫৩—৫৩ অনুবাক।
৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৫।১। ৬ নীলরুদ্রোপনিষৎ—৭।

—হে মৃড়! তোমার শুভকারী শর এবং মঙ্গলকর যে ধনু সেই মঙ্গলকর জ্যা এবং ইষু দ্বারা আমাদের জীবন প্রদান কর।

রুদ্রের শিবত্বে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে এত গভীরে মূল সঞ্চারিত করেছে যে কবি যখনই অনুভব করেছেন যে, তাঁর দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, যখনই অনুভব করেছেন কর্মজীবনে অথবা কাব্য-কর্মে উৎসাহের অভাব, যখনই বুঝেছেন অলসতা দেহমনকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনই তিনি আহ্বান করেছেন রুদ্রকে; আকাঙ্ক্ষা করেছেন, রুদ্রের আঘাত নেমে এসে তাঁর সকল ক্লান্তি সকল অবসাদকে ঘুচিয়ে দিয়ে দেহ-মনকে সজীব ক'রে তুলুক, এনে দিক নূতন জীবন,—নবীন কর্মোদ্যম।

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা
নিশীথ বেলা
সঘন বরষা, গগন আঁধার
হেরো বারিধারে কাঁদে চরিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা,
রাত্রিবেলা॥

* * * *

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা
মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।[১]

এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসারতা

১ ঝুলন, সোনারতরী।

ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সে আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।"[১]

রুদ্রের ভীষণরূপের প্রয়োজন জীবনে অনুভব করেন বলেই কবি স্বীয় জীবনে বারংবার রুদ্রকে আহ্বান করেছেন। রুদ্ররূপী ঝড় কবি-জীবনে এসে কবি-মনের সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় দূর ক'রে নূতন জীবন এনে দেবে ব'লে কবি বর্ষশেষের ঝড়কে আহ্বান করেছেন নিজের জীবনে।

মুক্ত করি দিনু দ্বার, আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়
আয় মোর বুকে

আবার অন্যত্র লিখেছেন,

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম, উঠি কিনা উঠি
অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি
তন্দ্রা জড়িমা মজিয়া।

* * * *

বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে;
ঝর ঝর করি রক্ত-আলোক
গগনে গগনে ঝরিছে;
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
কেহ বা স্বপনে ভরিছে।

১ সাহিত্যতত্ত্ব—সাহিত্য।

তোমার শ্মশান কিঙ্কর দল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারি
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি ।[১]

রুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রুদ্রের দানকে জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে কবি হবেন নূতন মানুষ, নূতন প্রভাত এসে হাজির হবে কবির জীবনে।

ভালই হয়েছে, ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা পড়েছে ছড়ায়ে
ভালই হয়েছে, প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহাসনে—
মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালায়ে
বজ্র শিখার দহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে ॥[২]

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।[৩]

প্রচণ্ড গর্জনে একী দুর্দিন
দারুণ ঘনঘটা অবিরল অশনি তর্জন
ঘন ঘন দামিনী ভুজঙ্গক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ ॥

১ সুপ্রভাত—পুরবী
২ ঐ ঐ
৩ গীতাঞ্জলি—৭৪

ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয় রূপে ভয় হরণ।[১]

মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ
গর্জি উঠুক সকল বাতাস
জাগিয়ে দিতে সকল বাতাস
পূর্ণতা বিস্তারো।[২]

কবি জানেন ভীষণ এবং সুন্দর,—ভালো এবং মন্দ, জন্ম এবং মৃত্যু আনন্দময়েরই বিচিত্র প্রকাশ।

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তব করুণা,
জয় তব ভীষণ সব কলুষ নাশন রুদ্রতা
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব
জয় শোক তব সান্ত্বনা।[৩]

কবি অন্যত্র লিখেছেন,

উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলেছে প্রত্যেক জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই যে জেগে উঠেছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তারপর কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত

১ গীতবিতান।
২ গীতাঞ্জলি—৯০।
৩ পূজা—৩৭৬।

হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রেই তার লীলা চলছে।"[১]

কবির অন্তর্যামিনী 'জীবন দেবতা' কখনও কখনও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হন কবির সমক্ষে।

"হে মোহিনী, নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোরা স্বামিনী।"[২]

কবির ঈশ্বর ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হন কবির জীবনে।

ঝড়ের বেশে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হুতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাহি যে বারে বার।
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।[৩]

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।[৪]

ঋষির মতই কবি প্রার্থনা করেছেন—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'।

ভুবনেশ্বরো হে—
মোচন কর জড় বিষাদ
মোচন কর হে।

১ শান্তিনিকেতন—চিরনবীনতা।
২ সাধনা—কল্পনা।
৩ গীতাঞ্জলি—২০।
৪ ঐ —৭৪।

প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ
ধূলি পতিত দুর্বল চিত্ত
করহ জাগরুক ॥[১]

জাগো হে রুদ্র জাগো—
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল সহে না সহে না গো ॥
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে, বিমুক্ত করো তারে।
তনুমন প্রাণ ধনজন মান, হে মহাভিক্ষু মাগো ॥[২]

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো ॥
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যু ভীত ॥[৩]

"হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং···

হে রুদ্র তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মত সঙ্কুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না।·········

অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার

১ ব্রহ্মসংগীত—৪।
২ পূজা—২৩৬।
৩ ঐ —২৩৪।

যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্মে মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ —হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে, তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা।"[১]

মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।[২]

—ইহলোকে যে আত্মা পরলোকে ও সেই আত্মা—পরলোকে যে আত্মা ইহলোকে ও সেই আত্মা। যে ব্যক্তি এই আত্মাতে নানা ভয়ের আরোপ করে, সে মৃত্যুর পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বার বার জন্মমৃত্যু লাভ করে।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি"[৩]—সেই ঈশ্বরকে জেনে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়।

"সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং
হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ।"[৪]

—সেই দেবতা দূরে, মৃত্যুও তাঁর কাছ থেকে দূরে। যিনি তাঁকে এরূপ অর্থাৎ (স্ব স্বরূপে) জানেন মৃত্যু তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকেন।

ঋগ্বেদ বলেন, হিরণ্যগর্ভের ছায়াই মৃত্যু—অমৃত ও তাঁর ছায়া। "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ"[৫] এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে: "বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যু ও তাঁর ছায়া; অমৃত ও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের

১ দুঃখ—ধর্ম।
২ কঠ—২।১।১০
৩ শ্বেতাশ্বতর।
৪ বৃহদারণ্যক—১।৩।৯।
৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।২।

মধ্যে এক করে রেখেছেন। তাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেছে, তিনি হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।"[১]

আত্মস্বরূপ অধিগত হয়েই মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ জয় করেছেন মৃত্যুভয়কে। "হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম, প্রিয়তম, এই আমি-নিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেইজন্যই তো এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান; সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই দুঃখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু,—এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছুই চাই নে।"[২]

কবির কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই মৃত্যুঞ্জয় ঋষির উদাত্ত গম্ভীর স্বর। জীবনে মরণে একের লীলার কথা বারংবার তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে
চিরজনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে।[৩]

কবি ঘোষণা করেছেন, মৃত্যুর চেয়ে তিনি অনেক বড়, অনেক বেশী সত্য।

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্‌,
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।[৪]

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।[৫]

ভারতবর্ষ চিরদিনই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। জীবাত্মা অসীম একেরই অংশ। দেহ ধ্বংস হয় আত্মা নয়। আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করে মাত্র।

১ প্রেম—শান্তিনিকেতন।
২ বিশেষ—শান্তিনিকেতন।
৩ গীতাঞ্জলি—৩।
৪ বলাকা—৩৭,।
৫ মৃত্যুঞ্জয়—পরিশেষে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥[১]

—বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও জন্মান না,—কখনও মরেন না—কখনও অজ, নিত্য, শাশ্বত—চিরপুরাতন আত্মা ছিন্ন হন না,—শরীর হত হ'লেও তিনি হত হন না।

"এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ, জীবাপেতং
বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি ।।"[২]

—হে সোম্য জীবপরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, জীব মরে না।

আত্মার অনশ্বরত্ব সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়ম দাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥[৩]

শস্ত্র সকল আত্মাকে ছিন্ন করতে পারে না, আগুন পারে না দগ্ধ করতে, জল পারে না পচাতে, বায়ু পারে না শুষ্ক করতে। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য,—ইনি সর্বব্যাপী রূপান্তরহীন, অবিকৃত এবং অনাদি।

ভগবান বলছেন, তিনি স্বয়ং মৃত্যুরূপ ধারণ ক'রে জগতের ধ্বংসরূপে প্রকটিত হন।

"মৃত্যু সর্বহরশ্চাহম্।"[৪]

অথর্ববেদ বলছেন, প্রাণরূপী আত্মাই মৃত্যু—"প্রাণঃ মৃত্যুঃ।" জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি ভারতীয় ঋষিরা। রবীন্দ্রনাথও এই আত্মাকে (আত্মারূপী ঈশ্বরকে) জীবন-মৃত্যুর অতীত রূপে বর্ণনা করেছেন।

১ কঠ—১।২।১৮।
২ ছান্দোগ্য—৬ অঃ ১১ খণ্ড।
৩ গীতা—২।২৩-২৪।
৪ ঐ—১০।৩৪।

জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে তুমি রয়েছো দাঁড়ায়ে।[১]

কবি আত্মার প্রকাশরূপ 'অহং' এর সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ন ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্ম মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে; আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে চায়।"[২]

মৃত্যুরূপী ঈশ্বর মৃত্যুর দ্বারপথে পুরাতন জীর্ণতাকে সরিয়ে নব-জীবনেব অভ্যুদয় ঘটান।

বিশ্বলোক নিত্য যাঁর শাশ্বত শাসনে
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতিক্ষণে ক্ষণে,
আবর্জনা দূরে যায় জরাজীর্ণতার,
তাঁরে নমস্কার।
যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তরদিন
নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন,
ক্ষয় শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার,
তাঁরে নমস্কার।[৩]

পাঞ্চভৌতিক দেহই জন্ম-মৃত্যুর অধীন,—আত্মা অজর অমর অব্যয়। আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে নব কায়া গ্রহণ করে মাত্র। তাতেই মৃত্যু এবং জন্মের মত দুই বিস্ময়কর ঘটনার সূত্রপাত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ মৃত্যুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্বর্ণকার যেমন পুরাতন স্বর্ণখণ্ডের মলামাটী পরিষ্কার ক'রে তা দিয়ে সুন্দর অলংকার তৈরী করে, পরমাত্মাও তেমনি একদেহ পরিত্যাগ ক'রে নূতন দেহ গ্রহণ করে। এইভাবে তিনি স্বেচ্ছায় কখনও পিতৃপুরুষের, কখনও গন্ধর্বের, কখনও প্রজাপতির, কখনও ব্রহ্মের, কখনও অন্যান্য প্রাণীর মূর্তি পরিগ্রহ করেন।[৪]

---

১ গীত বীথিকা—।

২ আত্মার প্রকাশ—শান্তিনিকেতন।

৩ গীতবিতান

৪ ৪র্থ অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাটাই নূতন ভাষায় নূতন ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার
হয় সে অমৃত পাত্র সীমার ফুরালে অহংকার।[১]

মৃত্যুর অর্থ সীমার বাঁধন কাটিয়ে বিশ্বাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংগম,—নদী স্রোত যেমন সঙ্গত হয় সাগরে। "স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি—ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে' এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ
তদ্ বেদ্যাং পুরুষং বেদ যথা মা বো পরিব্যাথা ইতি।[২]

—যদ্রূপ সমুদ্রৈকগতি নদীসমূহ সমুদ্রে উপস্থিত হইলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, এবং তাহারা সমুদ্রনামেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বোক্ত পরিদ্রষ্টা পুরুষের (সর্বত্র সর্ববস্তুকে যিনি আত্মস্বরূপে দর্শন করেন এই পুরুষৈকগতি ষোড়শকলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়। তখন পুরুষ এই নামেই অভিহিত হন।

এইরূপে বিদ্বান কলাতীত ও অমর হন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—

রথচক্রের নাভিতে চক্রশলাকার ন্যায় যাঁহার কলা সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জ্ঞেয় পুরুষকে জানিবে, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যাথিত করিতে না পারে।[৩]

"ইমা সোম্যন নদ্যঃপুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্র-মেবাপি যন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি,তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমীয়মহমস্মীতি॥[৪]

১ শেষ—পূরবী।

২ প্রশ্নোপনিশৎ—৫ ৬

৩ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

৪ ছান্দোগ্য ৬ অঃ ১০ খণ্ড।

—হে সোম্য পূর্বদিকস্থিত গঙ্গাদি নদীসমূহ পুর্বদিকে ক্ষরিত হয়, আর পশ্চিমদিকের সিন্ধু প্রভৃতি নদীসমূহ পশ্চিম দিকে ক্ষরিত হয়। সেই নদীসমুহ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়, সমুদ্রেই গমন করে সমুদ্রই হইয়া যায়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে না যে আমি হইতেছি অমুক নদী,—আমি হইতেছি অমুক নদী।"[১]

মহাজীবনের মাঝে ব্যক্তিজীবন মিশে গেলে বিশিষ্টতা হারায় ব্যক্তি। থাকে শুধু এক অসীম অনন্ত সাগরতুল্য প্রাণের সাগর। জীবনের স্রোত অনন্ত জীবনে মিশে একাকার হ'য়ে যাওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি
চারিদিক হ'তে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হ'তে ঝরে ধারা, চন্দ্র হ'তে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হ'তে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে স্রোতোভরে—
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে।[২]

মৃত্যু বলেছে :

যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোন গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে
সে সমুদ্র আমিই।[৩]

১ দুর্গাচরন সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
২ অনন্ত জীবন।—প্রভাত সঙ্গীত।
৩ উনচল্লিশ, শেষ সপ্তক।

বহিল মরণরূপী জীবন স্রোতে
সে যে এই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে দেশে দেশে কালে কালে।[১]

প্রাচীন ভারতীয় ঋষির দিব্যজ্ঞানের আধুনিক উত্তরাধিকারী ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ অসীম বিশ্বে মৃত্যু দুঃখ খুঁজে পেলেন না।

তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে
যতদূরে আমি চাই ;
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।[২]

দেহের অবসান যখন অপ্রতিরোধ্য তখন মৃত্যুকে ভয় না ক'রে আত্মজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুকে জয় কর।

মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পাদাম্।
তস্মাৎ ত্বাং মৃত্যোর্গোপতেরুদ্ভরামি সা মা বিভেঃ ॥[৩]

—মৃত্যু দ্বিপদ জীবের প্রভু, মৃত্যু চতুষ্পদ জীবের প্রভু, সকল প্রাণীর ঈশ্বর (গোপতেঃ) সেই মৃত্যু থেকে তোমাকে উদ্ধার করবো। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করো না।

সোঽরিষ্ট ন মরিষ্যসি ন মরিষ্যসি মা বিভেঃ।
ন বৈ তত্র ম্রিয়স্তে নো যন্ত্যধমং তমঃ ॥[৪]

—হে মৃত্যু কর্তৃক হিংসারহিত, তুমি মরবে না—তুমি মরবে না, ভয় ক'রো না। সেখানে কেউ মরে না,—অন্ধকার লোকও প্রাপ্ত হয় না।

আর্ষ দৃষ্টির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুভয় জয় করেছেন। মৃত্যুর স্বরূপ জানেন বলেই চিরদিনই তিনি মৃত্যুকে অস্বীকার করেছেন।

আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না
দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।[৫]

১ গীতিমাল্য।
২ নৈবেদ্য।
৩ অথর্ব—৮।২।২৩।
৪ ঐ ৮।২।২৫।
৫ স্বদেশ—৭।

বলো অকম্পিত বুকে
তোরে নাহি করি ভয়
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।[১]

আর তো আমি ভয় করি নে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।......[২]

কবি কখনও মৃত্যুকে ভয় করেন নি,—ভয় করেননি দুঃখকে,—আঘাতকে। বরং দুঃখের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে কল্যাণময় শিবকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনে বারংবার দুঃখ আঘাতের প্রয়োজনীতা অনুভব করেছেন। কবি লিখেছেন, "বদ্ধজল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হ'তে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।"[৩]

ব্যক্তি জীবনেও রবীন্দ্রনাথ কোন আঘাতে বিচলিত হন নি। জীবনে বহু শোক, বহু দুঃখ, বহু আঘাত তিনি পেয়েছেন। একাই সংগ্রাম করেছেন নীরবে। কিন্তু তাঁর চতুষ্পার্শ্বর্তী কোন মানুষই তাঁর গভীর বেদনার আভাসটুকুও পান নি। এমন কি তাঁর ব্যক্তিজীবনের দুঃখ শোক বিশেষ কোন ছাপ ফেলে নি তাঁর বিশাল সাহিত্য সৃষ্টিতে (একমাত্র স্মরণ কাব্য ছাড়া), মাটীর মানুষ হ'য়ে মাটীতে বিচরণ ক'রেও কবির মন অনন্ত অসীমে বিচরণ করেছে।

মৃত্যুর পরে সেই অনন্ত সমুদ্রতুল্য অসীম পরমানন্দময়কে পুর্ণ ক'রে পাবেন বলেই মৃত্যুর জন্য কবি প্রস্তুত।

মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

১ বলাকা—৩৮।
২ বলাকা—৩৭।
৩ সাহিত্যতত্ত্ব— ।

সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে
দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।[১]

বেদের ঋষি রুদ্রের কাছে মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করছেন :

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।
উর্বারুকমিব বন্ধান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ ॥[২]

—সুগন্ধি (সকল লোকের তৃপ্তি সাধক) সকল লোকের পুষ্টিসাধক দেব ত্র্যম্বক (রুদ্র) কে যজনা করি। বৃন্তচ্যুত পক্কফলের (উর্বারুক) মত আমি মৃত্যুর বন্ধন থেকে যেন মুক্তি পাই; অমৃত থেকে বিচ্যুত যেন না হই। জীবনে কবি প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। মৃত্যুর জন্য প্রশান্ত প্রতীক্ষা এবং মৃত্যুর পরপারে অনন্তের স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

হেথা যাত্রী আমি শুধু, অপেক্ষা করিব লব টীকা,
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণ-লিখা
দিবে যবে যাত্রার ইঙ্গিত।[৩]

ঋষির প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ক'রে কবি অমৃত পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন,—'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'

হে দুয়ার, বীজ হতে অংকুরের দলে
খোল পথ ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তরে কর অবারিত
মৃত্যু হতে পরম অমৃত।[৪]

১ গীতাঞ্জলি—১৩০
২ শুক্লযজুর্বেদ—৩.৫৯;৬০।
৩ জন্ম দিনে—সেঁজুতি।
৪ দুয়ার,—পরিশেষ।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভোগ ও ভোগবিরতি

'কালিদাসের সৌন্দর্য-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে ধর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্য্য ভোগের এবং ভোগ-বিরতির কবি বলা যাইতে পারে।"—মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কবির নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আত্মপ্রকৃতিকেই রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের কাব্যে আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য বিশ্লেষণ করলে ঐ এক কথাই বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সম্ভোগের কবি এবং সৌন্দর্য বিরতির কবি। কবির আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য আস্বাদন করবেন তিনি।

লিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে।[১]

ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা পরা তব কটিদেশ।[২]

চিরজীবন সৌন্দর্য পান ক'রেও কবি অতৃপ্ত।

এখনও মেটে নি আশা
এখনো তোমার স্তন অমৃত পিপাসা
মুখেতে রয়েছ লাগি।[৩]

একদিকে সৌন্দর্য-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ব-সৌন্দর্যের স্রষ্টা, সকল সৌন্দর্যের আধার সুন্দর-শ্রেষ্ঠকে পাবার জন্য অন্তহীন

---

১ বসুন্ধরা—সোনারতরী।
২ ঐ ঐ।
৩ ঐ ঐ।

এষণা ;—সাধকোত্তমের সাধনা সব কিছু ভুলে আরাধ্যের চরণে আত্ম-সমর্পণের।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।[১]

* * * *

তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে :
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়নজলে।[২]
এই আবরণ হবে গো ক্ষয় হবে
এই দেহ ভূমানন্দময় হবে।
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে॥[৩]

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যই সৌন্দর্য সম্ভোগ ও সৌন্দর্য বিরতির কাব্য। এখানেও সেই ভারতীয় সাধনার সত্য—সীমা-অসীমের তত্ত্ব,—সীমার ভেতর দিয়েই সীমাকে অতিক্রম করার তত্ত্ব। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, বেদ-উপনিষদের সংস্কার রবীন্দ্রনাথকে কালিদাসের কাব্যের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত করেছে এবং রবীন্দ্রকাব্যের আসক্তি-অনাসক্তির লীলার মাঝেও আত্মগোপন ক'রে আছে। সংসারের মধ্যে থেকে কর্ম ক'রে জগৎ ও জীবনকে ভোগ করতে করতে অমৃতত্ব লাভের সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষের ঋষি। ভোগ করবে কিন্তু ত্যাগের দ্বারা—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীয়াঃ'। ত্যাগের

১ —গীতাঞ্জলি ১।
২ ঐ ৫১।
৩ পূজা—১৮৮।

আদর্শ না থাকলে ভোগ কেবল স্বার্থপরতা,—অন্তহীন অতৃপ্তি মাত্র। ভারতবর্ষের ত্যাগ ধর্ম সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার ক'রে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলেছেন, সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ,—ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ অর্থাৎ যা-কিছু সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয় সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্যলোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।"[১]

কেবল সৌন্দর্য-সম্ভোগ সম্পর্কেই নয়, প্রেম সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাই। কড়ি ও কোমলে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের প্রাধান্য থাকলে ও দেহাতীত প্রেমের কথাও অস্বীকৃত হয় নি। মানসীতে দেহাতীত প্রেমেরই প্রাধান্য। 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমে উত্তরণের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুরদাসের জবানীতে কবি বলছেন,

যাক, তাই যাক। পারি নে ভাসিতে
কেবলি মুরতিস্রোতে।
লহো মোরে তুলে আলোকমগন
মুরতি ভুবন হতে।

* * * *

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ—
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।

কবির ধ্যেয় প্রেম তাই অনন্ত-প্রেম—যা যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর স্থায়ী।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

১ তপোবন, শিক্ষা।

চিরকাল ধরে মুগ্ধহৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার—
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে আনিবার।[১]

কবির দৃষ্টিতে নারীরও দুই রূপ : এক প্রেয়সী আর এক দেবী বা কল্যাণী।

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।'

* * * *

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি',
আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়।[২]

রাতে ও প্রাতে নারীর দুই রূপ :

একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ, প্রাণেশ্বরী—
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে,
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে।[৩]

১ অনন্তপ্রেম—মানসী ২ দুই নারী—বলাকা। ৩ রাত্রে ও প্রভাতে—চিত্রা।

নারীর দুই রূপের মত প্রেমেরও দুই রূপ। কবির বিশ্বাস, যে প্রেম দুটী হৃদয়ের সীমায় আবদ্ধ, সে প্রেম দেশের কিম্বা সমাজের কল্যাণ আনতে পারে না। যে প্রেম দুটী জীবনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হ'য়ে চতুর্দিকে আলো ছড়ায় দীপশিখার মত, সেই প্রেমই সার্থক, মহান্। "যে অন্ধ প্রেম-সম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকার প্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষি-শাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত, তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠতে পারে না। যে আত্ম-সংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গল মাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহ আঘাত করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না।"[১]

কবির মতে সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের অভিমুখী যে প্রেম সেই প্রেমই ধন্য। "নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"[২]

"এই প্রেম স্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ বলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।[৩]

চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে এই প্রেমেরই তত্ত্ব। রাজা ও রানী নাটকে প্রেমের এই দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বই অনুস্যূত। রাজা বিক্রমদেবের প্রেম সসীম সুতরাং বন্ধ্যা। রানী সুমিত্রার প্রেম কল্যাণাশ্রয়ী অসীমের অভিমুখী। তাই রানীর মুখে শুনি :

১ কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা—প্রাচীন সাহিত্য
২ ঐ ঐ
৩ প্রেম,—শান্তিনিকেতন।

মহারাজ

যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।[১]

'শেষের কবিতা'র অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের পরিণতিতে বোধহয় এই তত্ত্বটুকুই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অমিতের মুখ দিয়ে কবি প্রেমের দ্বৈতরূপের কথাই বলেছেন। "অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে সে না হ'লে প্রাণ বাঁচে না; আবার অক্সিজেন আর একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার—দুটোর কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।"

অমিত কেতকী ও লাবণ্যের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ক'রে বলেছে, "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

অমিতের উক্তিতে প্রেমের দ্বিবিধ রূপের ব্যাখ্যা আছে। পাত্র দুই হ'লেও সংকীর্ণ প্রেম যে মানব মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না—সীমার মাঝে অসীমের আস্বাদই যে মানব মনের কাম্য—এ তত্ত্ব এখানে স্পষ্ট। অবশ্য বৈষ্ণব দর্শনের 'স্বকীয়া' এবং 'পরকীয়া' তত্ত্ব ও এখানে অনুস্যূত আছে।

প্রেমের দ্বৈত সত্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। একপারে চোরাবালি আর একপারে ফসলের খেত। একপারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য অন্যপারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুইজাতের প্রেম। একটাতে প্রধানতঃ আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখতে পাই। তাতে সন্তানকে বড়ো করে না তুলে তাকে অভিভূত করে, তাতে কোন পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে প্রেম তো রিপু।[২]

১ ২য় অংক, ২ য় দৃশ্য।

২ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী—১৪ ফেবরুয়ারী। ১৯২৫

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রেমের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী।

"প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা ; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।"[১]

১ বুদ্ধদেব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ

ভারতীয় কর্মযোগের জীবন্ত বিগ্রহ রবীন্দ্রনাথ। সারাজীবন তিনি কাজ করেছেন অক্লান্তভাবে। তাঁর কর্ম—সাধনা—চিন্তা নিজের ভোগ সুখের উদ্দেশ্যে নয়,—দেশের, দশের, সমাজের, সারা বিশ্বের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। বেদে উপনিষদে গীতায় পুরাণে সর্বত্রই কর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। ভারতীয় কর্মের আদর্শ: কর্মের দ্বারা মুক্তি অর্জন,—বিদ্যা—অবিদ্যা, সম্ভূতি অসম্ভূতি, কর্ম ঈশ্বর-চিন্তা,—দুয়ের একত্র উপাসনা দ্বারা অমৃতের অধিকারী হওয়া। ভারতীয় কর্মযোগের মাহাত্ম্যটুকু রবীন্দ্রনাথের আর্ষ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। কবি লিখেছেন, "ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্মের ভেদ সাধন করে নাই। এজন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। আমরা বলি, মানুষমাত্রেই চরম লক্ষ্য কর্ম হইতে মুক্তি, এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ধর্ম।·· ···সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।"[১]"...... কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না, এ কোনমতেই হতেই পারে না।

এইজন্যই তিনি পুনশ্চ বলেছেন, যারা কেবল অবিদ্যার অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন। কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে।[২]

---

১ ধম্মপদং—প্রাচীন সাহিত্য।

২ কর্ম,—শান্তিনিকেতন।

গীতার কর্মযোগ উপনিষদের কর্মযোগেরই ভাষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঋষিদের ব্যাখ্যাত কর্ম যোগকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। তিনি একজায়গায় লিখেছেন, "গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তাঁর নিষ্কাম রূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয়, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না।"[১]

আসলে ভোগই বল, ধর্মই বল, আর কর্মই বল,—সবার লক্ষ্যই ত কল্যাণ, প্রেয়ঃকে গ্রহণ শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে। যে প্রেয়ঃ শ্রেয়োলাভ ঘটায় না, সে প্রেয় নিয়ে কি হবে? "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"—এই ত ভারতবর্ষের শেষ কথা। শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথের পথ চলা। তাঁর জীবনের তথা কর্মের লক্ষ্য ধ্রুব;—সেধ্রুব শ্রেয়োলাভ। ভারতবর্ষের ঋষি শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণ কামনা করেছেন কায়মনোবাক্যে। সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি শ্রেয়োলাভের সহায়ক হোক, এই ছিল ঋষির পরম এবং চরম কামনা।

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং
পশ্যেমাক্ষভিঃ.................. ।[২]

—হে দেবগণ, তোমাদের কৃপায় আমরা যেন কল্যাণকর শব্দ শ্রবণ করি, চক্ষু দ্বারা কল্যাণকর বস্তু দর্শন করি।

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতি শং নো বিষ্ণুরুক্রমঃ ॥[৩]

—মিত্র আমাদের মঙ্গল করুন। অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব আমাদের মঙ্গল করুন। ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বহুব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণ করুন।

সংবর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং দিবেন।
ত্বষ্টা সুদত্রো বিদধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্বিলিষ্টম্ ॥[৪]

১ পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী।
২ ঋগ্বেদ—১।৮৯।৮।
৩ ঐ ১।৯০।৯।
৪ শুক্ল যজুর্বেদ—২।২৬।৪।।

—আমরা যেন তেজের সহিত, অমৃতের সহিত, সৎকর্মানুষ্ঠানক্ষম দেহের সহিত, মনের সহিত, কল্যাণের সহিত মিলিত হই। ত্বষ্টা (বিধাতা) (কল্যাণরূপী) শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, আমাদের দুর্বল অঙ্গ সৎকর্ম সাধনোপযোগী যেন দৃঢ় হয়।

আদিত্যৈ র্নো অদিতিশৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্।[১]

—আদিত্যগণের সঙ্গে অদিতি শুনুন, মরুদগণ আমাদিগকে সুখ ও কল্যাণ দান করুন।

ঋষি সবিতৃদেবের জ্যোতির্ময় রূপের আড়ালে কল্যাণতম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের এবং বিশ্বমানবের কল্যাণ-চিন্তাই ঋষির সাধনা। রবীন্দ্রনাথও নিজের, দেশের, দেশবাসীর, বিশ্বের এবং বিশ্ববাসীর শ্রেয়ঃচিন্তা করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর কাব্যও শ্রেয়ঃ চিন্তা প্রসূত। কবি লিখেছেন, "যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।·· ······ এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব-চিত্তের ঘাত প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল।[২]

ভারতের ধ্যান-ধারণায় কল্যাণকে পরমার্থরূপে গ্রহণ করার স্বীকৃতি পাই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই : "অন্তত ভারতবর্ষ লাভের চেয়ে কল্যণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে কী বুঝিয়া মানিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"[৩]
কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত প্রেমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণাত্মক সম্বন্ধকেই স্বীকার করেছেন। "ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"[৪]

ধনের লোভ—প্রবৃত্তির লালসা শ্রেয়োলাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাই

১ ঋগ্বেদ—৩।৫৪।২০।
২ আমার ধর্ম।
৩ ধম্মপদং—প্রাচীন সাহিত্য
৪ কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা...ঐ

ঋষি লোভ ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। "মা গৃধঃ কস্যসিৎ ধনম্।"—কারো ধনে লোভ কোরো না,—ঋষির এই চিরন্তন বাণী। রবীন্দ্রনাথও লোভকে কল্যাণের অন্তরায় ব'লে বিশ্বাস করতেন। তাই 'লোভীর নিষ্ঠুর লোভ'কে তিনি কোন'দিন ক্ষমা করতে পারেন নি। সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা শ্রেয়ঃ চিন্তার দ্বারা এই লোভকে ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি। "বোধের তপস্যায় বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিষকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিষটা শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিষকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিষটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্যই ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক ; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচার বুদ্ধিকে সামঞ্জস্য ভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।"[১]

কবি নিজের জীবনেও লোভ জয় করার মন্ত্রকে পরমার্থ বলে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি : তেন ত্যক্তেন তুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারি মধ্যে চিরন্তন, লোভ করো না। কাব্য সাধনার এই মন্ত্র মহামূল্য।[২]

ইউরোপের প্রচণ্ড কর্মশক্তি এবং সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়েও তার লুব্ধতা এবং শ্রেয়োবিমুখতাকে কবি বারংবার নিন্দা করেছেন। কবি লিখেছেন, "তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তি ভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তিতে য়ুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই, কোথায়

১ তপোবন—শিক্ষা

২ আত্মপরিচয়—৫।

যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়, তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তু সঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে।"[১]

ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডার যেখানে সঞ্চিত ছিল—যেখানকার মৃত্তিকায় বসে তপস্যা দ্বারা ঐ অনন্ত জ্ঞানরাশি আয়ত্ত হয়েছিল—যেখান থেকে ঐ জ্ঞানরশ্মি শিষ্যে প্রশিষ্যে দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সেই তপোভূমি তপোবনের জন্য কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা কম ছিল না।

ইউরোপীয় জড়সভ্যতা অপেক্ষা ভারতের তপোভূমির জ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব কবি যেমন বারংবার ঘোষণা করেছেন, তেমনি ভারতে পুনর্বার তপোবনের আবির্ভাব তিনি কামনা করেছেন।

দাও ফিরি সে অরণ্য লও এ নগর—
লহো তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,……[২]

তপোবনের শিক্ষা এবং সাধনার প্রয়োজন বর্তমান যুগেও কবি অনুভব করেছেন। কবি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত বর্তমান ভারতের বাঁচার কোন উপায় নেই।

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি
হে ভারত, সর্বদুঃখে রহ তুমি জাগি
সরল নির্মল চিত্ত; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি—পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্য মন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি দুঃখ নম্রশির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে।[৩]

১ স্বাধিকার প্রমত্ত—কালান্তর।

২ সভ্যতার প্রতি—চৈতালি। ৩ নৈবেদ্য…৬৭

আবার,

তুমি থেকো সাজি,
চন্দনচর্চিত স্নাত নির্মল ব্রাহ্মণ ;
উচ্চশির উর্ধ্বে তুলি গাহিয়ো বন্দন,
'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপ শিখা
করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।
তব ধৈর্য দৈববীর্য ; নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।'[১]

বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও কবি তপোবনের শান্ত-প্রকৃতির মাঝে শিক্ষালাভ করাকেই যথার্থ শিক্ষা ব'লে বিবেচনা করেছেন। কবি লিখেছেন, "এদেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল ; সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন, পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।"[২]

যেখানে সাধনা চলছে, সেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধ বুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।"[৩]

কবি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থলে বিদ্যালাভের আয়োজনের উদ্দেশ্যে। "বর্তমানকালে দেশে এইরকম তপস্যার স্থান এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন

১ ঐ—৬৮
২ ধর্ম শিক্ষা—শিক্ষা।
৩ তপোবন—ঐ।

ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্ততঃ তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।"

তপোবনের আদর্শে গড়ে তোলা সেই একটি বিদ্যালয় কবির ব্রহ্মচর্যাশ্রম,—শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে কবি ভারতীয় আদর্শের বিদ্যালয় গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন এবং নিজের স্বপ্নকে সফল করতে সমর্থও হয়েছিলেন। কবি লিখেছেন, "শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে। অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে আপনারা আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম; কারণ, আনুমানিক কথায় কোন মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে।"[২]

১। তপোবন—শিক্ষা।

২ ধর্ম শিক্ষা—শিক্ষা।

চতুর্দশ অধ্যায়

ধর্ম

আত্মজ্ঞানের আলোকে কবির মন উদ্ভাসিত ব'লেই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সাধারণের থেকে ভিন্ন। শাস্ত্রে যাকে ধর্ম বলে, লোকাচার যাকে ধর্ম বলে, মানবমনের সংস্কার-প্রবণতা যাকে ধর্ম ব'লে আঁকড়ে ধরতে চায়, কবির সংস্কারমুক্ত মন তাকে ধর্ম ব'লে মানতে পারে নি। আচার অনুষ্ঠান এবং বিধিনিষেধের বেষ্টনীকে যাঁরা ধর্ম ব'লে মানেন, কবি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম শ্রেয়োবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ধর্ম সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে,—সকল সংস্কার এবং অন্ধতার অতীত, সেই ধর্মই কবির ধর্ম। সে ধর্ম মানবতার ধর্ম—ন্যায়ের ধর্ম। যাতে আনে মানবাত্মার কল্যাণ,—তাকেই কবি যথার্থ ধর্ম বলেন। কবি লিখেছেন, "আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হ'য়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে; এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যে ও একেকে পূজা করে।"[১]

কবির ধর্ম শান্ত-শিব-সুন্দরের আদর্শে গঠিত এবং অসীমের অভিমুখে ধাবিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে যে ধর্মসাধনার প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল শান্ত সমাহিত। "সাধারণতঃ বাঙ্গালাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।"—কবির এই উক্তি থেকেই জানা যায় যে তাঁর ধর্ম চিন্তা মহর্ষির ধর্মসাধনা তথা ঔপনিষদিক জ্ঞানের দ্বারা

১ আত্মপরিচয়—৩,

২ ঐ— ৫

প্রভাবিত। কবি নিজের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে আর এক জায়গায় বলেছেন, "সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত তাহাই মনুষ্যত্বের ছোটবড় অন্তর বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়। সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"[১] এইজন্যই ধর্মের উন্মাদনায় খ্রীষ্টান প্রাদ্রীকে প্রহার করাকে কবি কোন মতেই মেনে নিতে পারেন নি—বিদ্রূপের ছলে ধিক্কার দিয়েছেন।

সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর
কলংক গেছে ঘুচি।
মেজো বৌ কোথা, ডেকে দাও তারে
কোথা ছোকা, কোথা লুচি?.....[২]

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করে যা তাই প্রকৃত ধর্ম। কাহিনীর নাট্য-কাব্যগুলিতে, রাজর্ষি উপন্যাসে, বিসর্জন নাটকে, অন্যান্য কাব্যে এবং প্রবন্ধে কবি মানব-ধর্মের জয় গান করেছেন। যে ধর্ম স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত, যে ধর্ম সত্য অথবা প্রেম-বর্জিত, যে ধর্ম ন্যায়বোধকে আঘাত করে, তা যথার্থ ধর্ম নয়,—সে ধর্ম খণ্ডিত,—সে ধর্ম পরিত্যজ্য। পুত্র-স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র লোক লজ্জাগ্রস্তা জননী কুন্তী, ক্ষাত্রগর্বান্ধ রাজা সোমক,—রাজধর্মাভিমানী দুর্যোধন ব্রাহ্মণ্যগর্বান্ধ ঋত্বিক, বিসর্জনের রাজ পুরোহিত রঘুপতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি মানব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত। সকল স্বার্থবুদ্ধির অতীত, সকল সংকীর্ণতার অতীত যে ধর্ম সেই ধর্মের কথাই কবি ব্যক্ত করেছেন গান্ধারীর মুখ থেকে।

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু—
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

১ ধর্মপ্রচার—ধর্ম।
২ ধর্মপ্রচার—মানসী।

যে ধর্ম কুসংস্কার থেকে জাত,—যে ধর্মবোধ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত,—যে ধর্মবোধ নির্বুদ্ধিতা প্রসূত তাকে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বলেন নি,—বলেছেন ধর্মতন্ত্র। তাঁর ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক নয়। ধর্ম আর ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন কবি। "ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমান কারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয়, সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক, পুজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ, যে যত বড়ো অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"[১]

কবি অন্যত্র লিখেছেন, "যে ধর্ম মূঢ়তাকে বহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে মারে।...[২] বাহ্যিকতাকেই মানুষ ধর্ম বলে গণ্য করে কেন, সে বিষয়ে ও কবি আলোচনা করেছেন, "মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণকে এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই

১ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—কালান্তর।

২ রাশিয়ার চিঠি—৭।

দিনে দিনে এমন বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক, তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হ'য়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে আর সে খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।"[১]

"ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে, তখন যে সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমা গুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়,...... ।"[২]

ধর্মের নামে যেখানে মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়, সেখানেই কবি ধিক্কার দিয়েছেন। ধর্মের নামে উন্মত্ত বর্বরতাকেও কবি ক্ষমা করেননি। মানসীর ধর্মপ্রচার কবিতায় এই উন্মত্ততাকেই তিনি বিদ্রূপ করেছেন।

এসো মোনো, এসো ভূতো,
পরে লও বুট জুতো
হিন্দু-ধর্ম করিব রক্ষা
খৃষ্টানি হবে মাটি।

কবি ধর্মের উন্মাদনাকে কঠোর ভাবে ধিক্কার দিয়েছেন আর ধর্মরাজকে আহ্বান করেছেন ধর্ম মোহ নাশের জন্য।

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সে ও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

---

১ ভক্ত,—শান্তিনিকেতন।

২ রসের ধর্ম—ঐ।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে.
পিতার নামেতে হানে তার সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পুজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।
অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা—
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

* * *

হে ধর্মরাজ ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি
যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।[১]

আচার মূলক অনুষ্ঠান এবং মন্দির-মসজিদে দেব উপাসনাও কবির কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে গণ্য হয় নি। সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম যে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—সকল জীবে তাঁর অবস্থিতি। তাই ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের কল্যাণ সাধন করা,—জীবকে ভালবাসা—বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করাই ত ধর্ম—সেই ধর্মই মানবধর্ম—সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

কবি বলেন, "ধর্মের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সাধন। তখন সাধককে একথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পুজার্চনা আচার-অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না।……"[২]

১ ধর্মমোহ, পরিশেষ।

২ রসের ধর্ম—শান্তিনিকেতন।

তাই কবির দেবতা মন্দিরে নয়—মন্দিরের বাইরে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত।

আজ আপনার মনে ভাবি—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায়, নানা শাস্ত্রে
কল্পনা করেছি তাকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে;
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,

* * *

সকল মন্দিরের বাইরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে।[১]

কবি আরও লিখেছেন, "মহাত্মারা তাঁহাকে সহজে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের (অর্থাৎ মানব-ব্রহ্মের) উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের সর্বত্র সমান নয় ও অনেকস্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করছে, তাঁকেই বলছে—"এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

১ পনেরো—পত্রপুট।

জানিয়েছে—'স দেবঃ স নৌ বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—মানবের চিৎসত্তারূপ সেই পরম এক সেই দেবতা শুভবুদ্ধির দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করুন।"

গোরা উপন্যাসে গোরার মুখ থেকে কবির সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্মের পরিচয়টুকু আমরা পেয়েছি। "আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা"

নিজের ধর্ম সম্পর্কে কবি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন যে শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আচার অনুষ্ঠান পালন করা তাঁর ধর্মচর্যার অঙ্গীভূত নয়। "আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে—অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্‌ঘাটিত করে স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরস সম্ভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি।"[১] রবীন্দ্রনাথের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ঋষির ধ্যান-লব্ধ সীমা-অসীমেরই তত্ত্ব। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে লাভ করাই ধর্মের লক্ষ্য।

"সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোন সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।

কিন্তু মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য, সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপুর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই পরম গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে

১ আত্মপরিচয়।

সংলগ্ন। আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীম ও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।"[১]

আবার, "ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্ব সংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই।......অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা।...... আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীম ও মায়া।"[২]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকেই লাভ করা। "বস্তুতঃ স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে—এই তো তার পাপের মূল, এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।"[৩]

সীমা ও অসীমের মিলনে পরিপূর্ণ এক সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলব্ধির যে ধর্ম রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং কাব্যে দেখা যায় তা যে ভারতীয় ঋষির ধ্যানধারণারই নবতর ভাষ্য তা আর পুনরুল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিতেই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেই এর প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে আরও প্রচুর উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। একস্থানে তিনি লিখেছেন, "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"[৪] "গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের

১ সীমার সার্থকতা।—পথের সঞ্চয়।

২ সীমা ও অসীমতা—পথের সঞ্চয়

৩ স্বভাব লাভ,—শান্তিনিকেতন।

৪ স্বদেশী সমাজ,—আত্মশক্তি ও সমূহ।

দ্বারা দেবতা, ঋষি পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে।"[১]

কবি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর পরম কারুণিক এবং ন্যায়-বিচারক। তিনি ন্যায়ের প্রতিভূ। ঈশ্বরের বিচারালয়ে ন্যায়ের বিচার অহরহ চলছে।

কেঁদে বলি হে মোর সুন্দর,
করহ বিচার।
তারপরে দেখি,
একী
খোলা তব বিচারের দ্বার
নিত্য চলে তোমার বিচার।

ন্যায়াধীশ ভগবান তাঁর ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেক মানুষের হাতে অর্পণ করেছেন। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের বিধানকে মেনে চলা। ন্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী কবি তাই অন্যায়ের প্রতিকার করতে এবং ন্যায় পথে চলতে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু তারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারালয়ে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।[২]

১ স্বদেশী সমাজ—আত্মশক্তি ও সমূহ।

২ নৈবেদ্য—৭০।

কখনও কবি নিজের বিচারের জন্যই ন্যায়াধীশের কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার ঘরে॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি
যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপমনে করি অবিচার কাহারো 'পরে
আমার বিচার করো তুমি আপন করে॥[১]

কবি সারাজীবন অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে নির্ভিকভাবে ন্যায়ের আদর্শ সম্মুখে রেখে পথ চলেছেন। ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদের ধর্ম মানব-কল্যাণের ধর্ম। মানব-জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই ঋষির আকাঙ্ক্ষিত। তাই ভারতবর্ষের জীবন-চর্যা, সমাজ, কর্ম সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় জীবন-চর্যাই ভারতের ধর্মচর্যা। কবি বলেছেন, "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে 'রিলিজন' 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোন আশ্রয় নাই।"[২]

"আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা॥[৩]

ভারতবর্ষের ধর্মাদর্শটি কবি সকল সংকীর্ণতা কুসংস্কার ও অন্ধতার উপরে উঠে যথার্থভাবে অনুভব করেছেন। ভারতের ধর্মই কবির ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ পুর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী। যে ধর্ম পুর্ণতার অভিমুখী—যা শ্রেয়োবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাই কবির ধর্ম। এই সংস্কারমুক্ত—সংকীর্ণতার অতীত, মানবতার মহিমায় প্রোজ্জ্বল ধর্মবোধ যে উপনিষদের অধ্যাত্ম প্রভাব পুষ্ট, সে কথা পুনরুল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। একথা ও এ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য

১ পূজা—১১২।

২ সমাজভেদ—স্বদেশ।

৩ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—কালান্তর।

যে উপনিষদের ব্রহ্ম ন্যায়ের প্রতিভূ। তাঁর ন্যায়দণ্ডের ভয়েই বিশ্বচরাচর আপন আপন কাজ করে চলেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় সাধনার আদর্শ, ভারতীয় তপোবনে লব্ধ আত্মজ্ঞানের প্রচার ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ পুনরায় বেঁচে উঠতে পারবে না। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল, বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে ভারতবর্ষের শতশতাব্দীর তপস্যায় অর্জিত সুমহৎ জ্ঞান প্রচারের প্রয়োজন আছে। তাই কবি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারত-আত্মার মর্মবাণী। সে বাণী আত্মোপলব্ধির বাণী। আত্মোপলব্ধি আনে সর্বভূতে সমদর্শন,—সকল বিরোধের ঘটায় অবসান—স্থাপন করে ঐক্য-মৈত্রীর বন্ধন। কবি বিশ্বাস করতেন, বর্তমান পৃথিবীতে ভারতীয় জ্ঞানের আদর্শকে গ্রহণ না করলে মানুষের কল্যাণ হ'তে পারে না। তাই ঋষির মতই তিনি অমৃতের পুত্র মানুষকে শুনিয়েছেন অমৃতমন্ত্র। ভারতবাসীকে সাবধান করেছেন,

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।[১]

তিনি আশা প্রকাশ করেছেন জগৎকে আলোর পথ দেখাতে মহামানবের আবির্ভাব হবে এদেশেই। "আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববানী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।.........."[২]

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক।
এল মহাজনমের লগ্ন।

১ নৈবেদ্য—৬০।

২ সভ্যতার সংকট।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ কম নয়। তবে একথাও ও ঠিক যে বেদ-উপষিদের তত্ত্ব রবীন্দ্রমানসে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে সুগভীর প্রভাব সঞ্চার করেছে রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কে তেমন প্রভাবের কথা বলা যায় না। রামায়ণ মহাভারত কাব্য—মহাকাব্য—ইতিহাস—পুরাণ—ধর্মশাস্ত্র সবই। রাময়ণ-মহাভারতে যদি কোন তত্ত্ব বা দর্শন থাকে তবে তা ভারতের সনাতন ধর্মতত্ত্ব—বেদ-উপনিষদের শাশ্বত দর্শন। মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতা উপনিষৎ-সত্যের সার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকী রাখে নাই। এইজন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না।… ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরে মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।"[১]

এই দুই ঋষি কবির অমর কাব্য সৃষ্টি যে রবীন্দ্র চিত্তভূমিকেও পলি-মৃত্তিকা দ্বারা উর্বর ক'রে তুলবে তাতে আর বিচিত্র কি? রামায়ণ এবং মহাভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। তিনি লিখেছেন, "রামায়ণ—এবং মহাভারতকেও—আমি বিশেষতঃ এইভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে আস্থাশীল। সেই পূর্ণতার আদর্শ তিনি রামায়ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। "পরিপূর্ণতার প্রতি ভারত বর্ষের একটি

১ রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য।

২ ঐ ঐ

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই।……সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।"[১]

কবি আরও লিখেছেন, "রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।"[২]

মহাভারতের কৃষ্ণ এবং রামায়ণের রাম চরিত্র পূর্ণ মানবতার প্রতীক। পূর্ণতার উপাসক এবং মানবতার পুজারী রবীন্দ্রনাথ রাম চরিত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন। "মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন।"[৩]

দেবর্ষি নারদের কাছে মহর্ষি বাল্মীকির প্রশ্নে ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ মানবতার স্বরূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহো মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'।[৪]

১ রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য।
২ ঐ ঐ।
৩ রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য।
৪ ভাষা ও ছন্দ—কাহিনী।

বাল্মীকি রামায়ণে ও মহর্ষি বাল্মীকি নারদকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন।

কোন্বস্মিন্সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।[১]

নারদ উত্তর করলেন :

ইক্ষ্বাকুবংশ প্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী।
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রু নিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ॥
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধ বর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ॥
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতাঃ।
যশস্বী জ্ঞান-সম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্॥

*   *   *   *

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণ সম্পন্নং রামং সত্য পরাক্রমম্।[২]..

১ বাল্মীকি, রামায়ণ—আদিকাণ্ড—১ম সর্গ ২—৫।
২ ঐ ঐ ঐ ৮—১২, ১৭—১৯।

পূর্ণ মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের মনে রামচন্দ্রের আদর্শ যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন, "রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"[১]

রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব আরও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটির বক্তব্য যাই হোক, কবিতাটীর প্রেরণা যে বাল্মীকি রামাণের আদিকাণ্ডের ৪৯ অধ্যায়ে বর্ণিত অহল্যোপাখ্যান থেকে, তাতে সন্দেহ নেই। মালিনী নাটকে মালিনীর নির্বাসন সীতা নির্বাসনের সংগে সাদৃশ্য বহন করে। মালিনী-নির্বাসনের প্রাক্কালে রাজমহিষী প্রার্থনা করেছিলেন :

বসুগণ, রুদ্রগণ,
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
কন্যারে আমার। মর্তলোক স্বর্গলোক
হও অনুকূল—শুভ হোক, শুভ হোক
কন্যার আমার। হে আদিত্য, হে পবন,
করি প্রণিপাত, সর্বদিকপালগণ
করো দূর মালিনীর সর্ব অকল্যাণ।[২]

রাজমহিষীর প্রার্থনা বাক্য স্মরণ করায় নির্বাসন কালে রামচন্দ্রের কল্যাণের জন্য জননী কৌশল্যার প্রার্থনা :

যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ ॥
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা ॥
*　*　*　*
সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যাশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষা ক্ষুপাহ্রদাঃ ॥

১ রামায়ণ,—প্রাচীন সাহিত্য।
২ মালিনী—৪র্থ দৃশ্য।

পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥

স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পুষা ভগোঽর্যমা।
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসব প্রমুখাস্তথা ॥

ঋতবঃ ষট্ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা ॥

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ।
স্কন্দশ্চ ভগবান্দেবঃ সোমশ্চেন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ॥

সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ।
তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥

স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু মাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ ॥

দ্যৌরন্তরিক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ স চরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ ॥
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্ ॥[১]

সোনারতরীর পুরস্কার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণ সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্য কাহিনী রঘুকুল রবি
রাঘবের ইতিহাস—
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়াছে দগধি
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।

[১] অযোধ্যা কাণ্ড, ২৫ সর্গ ৪—৫, ৭—১৫।

অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার—
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।

আর একদিন ভেবে দেখো মনে
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটীর ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি—
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে
মহা অরণ্য আঁধার আননে
রহিল নীরবে চাহি।

এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভা মাঝে
বিদায় বিনয়ে নমি রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।

*

দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,—
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,—
সরযুর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যামলেখা।

শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে ;······

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভারত কথার বর্ণনা :

তারপরে কবি কহিল সে কথা
কুরুপাণ্ডবের সমর বারতা—
গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্বদেশ ;

*　　*　　*　　*

বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ ;
সমাধা যজ্ঞ মহানরমেধ
বিদ্বেষ হুতাশনে।

সকল কামনা করিয়া পূর্ণ
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ
পাঁচ ভাই গিয়া বসিল শূন্য
স্বর্ণ সিংহাসনে।

স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ আঁধার
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার—
রাজপুর বধূ যত অনাথার
মর্ম বিদার রব।

'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয় ,
পরিহাস বলে আজি মনে হয়
মিছে মনে হয় সব।

কালি যে ভারত সারাদিন ধরি
অট্টগরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি কুলভয় লাজে,
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসী বেশে অঙ্গ ঢাকিয়া

বসি একাকিনী শোকার্ত হিয়া
শূন্য শ্মশান মাঝে !···

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বৌদ্ধ গাথা ও ভারতীয় ইতিহাসের অনেক গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কাব্যে এবং নাটকে নবরূপ দান করেছেন। 'বিদায় অভিশাপ', 'ভাষা ও ছন্দ' কাহিনীর নাট্যকাব্যগুলি, 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি, নটীর পূজা প্রভৃতি নাটক এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। ঋষি প্রণীত কাব্য ইতিহাস গাথা প্রভৃতিকে কবি কী শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রমাণ এগুলিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারতকে কবি কাব্য বলেন নি—বলেছেন ইতিহাস। "···রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে—রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।"[১]

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এবং বৌদ্ধকাহিনীগুলিকে আশ্রয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মাদর্শ তথা মানবতার আদর্শকে পরিস্ফুট করেছেন। মনে হয় এই আর্যকাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং সাহিত্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ ঋণ গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেবের উদার ধর্মমতও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের এক মূল্যবান অধ্যায় তথা উপাদানরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এগুলির আলোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থেও তিনি ভারতআত্মার প্রাণ-স্পন্দনকে অনুভব করেছেন। কবি লিখেছেন, "ভগবদ্‌গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে।"[২]

ঋষির সাধনায় গড়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা নিবেদন থেকে বোঝা যায় রামায়ণ মহাভারত এবং বৌদ্ধ কাহিনী কবির চিত্তে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য।
ধর্ম্মপদং—প্রাচীন সাহিত্য।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহারিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।[১]

মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতার আত্মতত্ত্ব এবং মৃত্যু তথা আত্মার দেহান্তর গ্রহণের তত্ত্ব রবীন্দ্রচিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। গীতার "জীর্ণানি বাসাংসি যথা বিহায়" ইত্যাদি শ্লোকটির ছায়া রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত কবিতাটিতে স্পষ্ট :

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার ॥
দিনের কাজে ধুলা লাগি অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে সহ্য করা ভার
আমার এই মলিন অহংকার ॥

মহাভারতের দুটি শ্লোকেরও কবি পদ্যানুবাদ করেছেন। একটি শ্লোক :

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্।
অপি চাস্য শিরশ্ছিত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ ॥[২]

রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ :

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো।[৩]

১ নৈবেদ্য—৯৪।
২ আদিপর্ব ১৪০।৫৬।
৩ রূপান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খঃ, শতবার্ষিক সং।

অপর শ্লোকটি :

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥[১]

রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ :

সুখ বা হোক দুখ বা হোক
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করিয়া নিয়ো ॥[২]

এই অনুবাদটির আরও দুটী পাঠান্তর আছে।

১ শান্তিপর্ব ১৭৪।৩৯।

২ রূপান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খঃ, শতবার্ষিক সং।

ষোড়শ অধ্যায়

রূপকল্প ও রূপান্তর

উপনিষদের আত্মজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরাজ করেছে। কতকগুলি কবিতাতে বেদ উপনিষদের মন্ত্র সক্রিয় প্রেরণারূপে কাজ করেছে। পূর্বোদ্ধৃত গদ্য পদ্য রচনায় এই প্রেরণার প্রমাণ কতক কতক মিলবে। পূর্বের উদ্ধৃতি ছাড়াও কবির বিশাল সৃষ্টির নানা স্থানে বৈদিক মন্ত্রের সক্রিয় প্রভাব অনুভূত হয়। 'সোনারতরী' কাব্যের 'আকাশের চাঁদ' ও 'পরশ পাথর' কবিতা দুটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই কবিতা দুটীতে ঈশোপনিষদের—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ এব তে তমঃ য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মনে হয় যেন উক্ত কবিতা দুটি ঈশোপনিষদের বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনার ভাষ্য। 'সোনারতরী'র 'দুইপাখী' কবিতায় একটি ঋক্‌মন্ত্রের ছায়া সুস্পষ্ট। মন্ত্রটি মণ্ডূকোপনিষদেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও নানা প্রসঙ্গে মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন। "দুইপাখী' কবিতায় সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনতত্ত্ব অনুস্যূত থাকলেও নিম্নোক্ত মন্ত্রটির প্রত্যক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজায়তে।
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভি চকাশীতি॥[১]

দুটি সখ্যতাবদ্ধ পক্ষী সর্বদা একসঙ্গে একটি বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে থাকে; তাদের মধ্যে একজন স্বাদুফল ভোজন করে, অপরজন ভক্ষণ না করে কেবল চেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।২০, মণ্ডুক ৩।১।১

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখী বলে, 'খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে'।
খাঁচার পাখী বলে, 'বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে'।

এই দুই পাখীর তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসংগে ব্যাখ্যা করেছেন। এক স্থানে তিনি লিখছেন, "উপনিষদে লিখছে, একডালে দুই পাখী আছে, তার মধ্যে এক পাখী খায়, আর এক পাখী দেখে। যে পাখী দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ, কেন না, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন আছে। আর এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে আর এক পাখী দেখে। যে পাখী ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখী দেখে সে সৃষ্টি করে......।"[১]

ঋগ্বেদের উষাস্তোত্র ভাব-গাম্ভীর্যে এবং কাব্য সম্পদে অপরূপ। ঋগ্বেদের উষাবর্ণন রবীন্দ্রচিন্তায় ছায়াপাত করেছে। উষা বর্ণনায় ঋষি বলেছেন,

আবির্বক্ষঃ কৃণুষে শুম্ভমানোষা দেবি রোচমানা মহোভিঃ।[২]

—হে দেবি উষা, তোমার তেজের দ্বারা দীপ্ত হ'য়ে তোমার বক্ষঃ প্রকট কর।

উপ অদর্শি শুন্ধ্যুবো ন বক্ষো।[৩]

—সর্বশুচি আদিত্যের (যেমন কিরণময় বক্ষ সেইরূপ) অথবা সন্ধ্যু নামক শ্বেতপক্ষীর মত তোমার বক্ষ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

অপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।[৪]

১ যাপানদাত্রী ২।
২ ঋগ্বেদ—৬।৬৪।২
৩ ঐ ১।১২৪।৪
৪ ঐ

উষার বক্ষ উন্মুক্ত করার রূপকল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রভাত বর্ণনায়।

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।
আকাশে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।[১]

উষার স্তুতি করতে গিয়ে ঋষি বলেছেন:

ব্যঞ্জিভির্দ্দিব আতাম্বদ্যৌদপ কৃষ্ণাং
নির্নিজং দেব্যাবঃ।
প্রবোধয়ন্তরুণোভিরশ্বৈরোষা যাতি
সুযুজা রথেন॥[২]

—উষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিক সকল আলোকপূর্ণ তেজ দ্বারা দীপ্তিমান করিতেছেন, উষাদেবী (রাত্রিকৃত) কৃষ্ণরূপ দূর করিয়াছেন। (সুপ্ত প্রাণী-দিগকে) জাগরিত করিয়া উষা অরুণ অশ্ব (রশ্মি) যুক্ত রথে আগমন করিতেছেন।[৩]

উদীর্ধ্বং জীবো অসুন্ আগাদপ
প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়াগন্ম
যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥[৪]

(হে মনুষ্যগণ) উঠ, আমাদিগের (শরীর) পরিচালক জীবন আসিয়াছে—অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। (উষা) সূর্য্যের গমনের জন্য পথ করিয়া দিয়াছেন, যেখানে আয়ু দান করিয়া বর্দ্ধন করিতেছেন তথায় যাইব।[৫]

মাতা দেবানামদিতেরণীকং যজ্ঞস্য
কেতুর্বৃহতী বিভাহি।[৬]

---

১ বিকাশ—খেয়া।
২ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৪।
৩ অনুবাদ—রমেশ দত্ত।
৪ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৪
৫ অনু—রমেশ দত্ত।
৬ ঋক—১।১১৩।১৯।

—হে উষা তুমি দেবমাতা অদিতি, যজ্ঞের কারণরূপা, জ্ঞাপিকা, ব্যাপনশীলা, তুমি প্রকাশিত হও।

আপপ্রুষী বিভাবরি ব্যাবর্জ্যোতিষা তমঃ

উষো অনু স্বধামব ॥[১]

—হে কান্তিমতী উষা! তুমি (তেজ দ্বারা জগৎ) পরিপূর্ণ কর। তেজঃ দ্বারা অন্ধকার দূর কর, তৎপরে নিয়মানুসারে রক্ষা কর।[২]

আ দ্যাং তনোষি রশ্মিভিরান্তরিক্ষমুরুপ্রিয়ম্

উষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥[৩]

—হে উষা তুমি দীপ্ত তেজযুক্ত হইয়া রশ্মিদ্বারা দ্যুলোককে ব্যাপ্ত কর এবং বিস্তীর্ণ ও প্রিয় অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত কর।[৪]

প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং দ্বিপাচ্চতুষ্পা-

চ্চরথায় জীবম্ ॥[৫]

—হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ! তোমরা নিদ্রিত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ দিগকে স্ব স্ব কার্যে প্রবোধিত করতঃ যজ্ঞে গমনশীল অশ্বগণের সহিত ভুবন সমূহ ক্ষণমাত্র পরিভ্রমণ কর।[৬]

বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচী

চক্ষুরুর্বিয়া বিভাতি।

বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী বিশ্বস্য

বাচমবিদন্মনায়োঃ ॥[৭]

—দেবী (দ্যোতনাত্মিকা) উষা সকল জগৎ প্রকাশ ক'রে পশ্চিম মুখী হ'য়ে প্রকাশক তেজের দ্বারা বিস্তীর্ণ হ'য়ে প্রকাশ পান। সকল প্রাণীদেরই নিজ নিজ কর্মে প্রেরণের উদ্দেশ্যে জাগরিত ক'রে প্রাণীগণের মনে যে বাক্য আছে সেই বাক্যকে লাভ করেন (সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করেন)।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫২।৬।
২ অনুবাদ—রমেশ দত্ত।
৩ ঋক্—৪।৫২।৭
৪ অনু—রমেশ দত্ত।
৫ ঋক্—৪।৫১।৫
৬ অনু—রমেশ দত্ত।
৭ ঋক—১।৯২।৯।

উত্তে বয়শ্চিদ্বসতেরপপ্তন্নরশ্চ
যে পিতু-ভাজো ব্যুষ্টৌ।
অমা সতে বহসি ভূরি বামমুষো
দেবি দাশুষে মর্ত্ত্যায় ॥[১]

—হে উষা! তোমার উদয় হইলে পক্ষিগণ বসতিস্থান হইতে উর্ধ্বে উৎপতিত হইতেছে। অন্ন চেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ (উন্মুখ হইয়া) গমন করিতেছে। হে দেবি! (দেবযজন) গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্যের জন্ম বহুধন আনয়ন কর।[২]

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী
যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ
সুভগে ব্যুচ্ছ ॥[৩]

—চিরযৌবনা শুভ্রবসনা সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারিণী আকাশ দুহিতা উষা অন্ধকার দূর করতঃ (ব্যুচ্ছন্তী) সকলের দৃষ্টিগোচর হন। হে সুভগে, তুমি আজ এখানে (যজ্ঞস্থলে) অন্ধকার দূর।

এষা জনং দর্শতা বোধয়ন্তী সুগান্ পথঃ কৃণ্বতী যাত্যগ্রে।
বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বোষা জ্যোতির্যচ্ছত্যগ্রে অহ্নাম্ ॥[৪]

—সুদৃশ্যা উষা নিদ্রিতজনকে জাগরিত ক'রে পথ সুগম করতে করতে সূর্যের আগে আগে গমন করেন। বৃহৎ রথে আরূঢ়া মহতী বিশ্বব্যাপ্তা জ্যোতিস্বরূপা উষা দিনের অগ্রে গমন করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উষা-বর্ণন প্রসংগে বলেছেন,

"গোভিররুণৈরুষা আজি মধাবত্ত স্মাদুষ স্যাগতায়া-
মরুণ মিবৈব প্রভাত্যুষসো রূপম্।"[৫]

১ ঋগ্বেদ—১।১২৪।১২।
২ অনুবাদ ৺রমেশ দত্ত।
৩ ঋগ্বেদ—১।১৬।৭।
৪ ঐ—৫।৮০।২।
৫ ঐঃ ব্রাঃ ৪।২।৩।

ঈষৎ রক্তবর্ণ বলদ (রশ্মি) যুক্ত রথে যেহেতু উষা ধাবিত হন, সেইহেতু রাত্রি-অবসানে উষা সমাগত হ'লে উষার রূপ রক্তবর্ণ হ'য়ে প্রতিভাত হয়।

বেদের উষাস্তুতি প্রত্যেক সুধীজনকেই আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথের উষা বর্ণনায় যে তা ছায়া ফেলবে, তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। কবি প্রভাত এবং উষা বর্ণনায় লিখেছেন :

ওগো, এমন সোনার মায়াখনি
কে যে গড়েছে!
মেঘ টুটে আজ প্রভাত আলো
ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে
গাছে পালায় চমক লাগে
হৃদয় আমার বিভাস রাগে
কী গান ধরেছে![1]

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে
শূন্যভরে গানে;
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে
ক্লান্তি নাহি জানে।
কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।

১ বর্ষাপ্রভাত—খেয়া।

তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটীর গভীর অন্ধকারে,
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণ স্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।
তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্প ভারে।

*　　*　　*

তুমি সে আকাশ ভ্রষ্ট আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্তের গৃহের মাঝে বহিয়া এনেছ তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।[১]

বেদের উষাও সূর্যের দূতী।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অপূর্ব এবং বিস্ময়কর হ'লেও বেদের উষা বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের চিরযৌবনা উষা রবীন্দ্রনাথের অনন্ত যৌবনা উর্বশীর কল্পনাতেও প্রভাব ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথের রাত্রি বর্ণনাতেও ঋগ্বেদের রাত্রি বন্দনার প্রভাব সুস্পষ্ট। রাত্রির স্তুতি-প্রসঙ্গে ঋষিকণ্ঠে শুনতে পাই :

রাত্রি ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ
বিশ্বা অধি শ্রিয়োধিত।[২]

—বহুদেশে ব্যাপনশীলা (পুরুত্রা দেবী) প্রকাশমান নক্ষত্র দ্বারা (তেজের দ্বারা,—অক্ষভিঃ) শোভিতা রাত্রি উপস্থিত হ'য়ে দেখতে থাকেন এবং সকলের কল্যাণ করেন।

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বত
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।[৩]

১ আহ্বান, পূরবী।

২ ঋগ্বেদ—১০।১২৮।১।

৩ ঐ—১০।১২৮।২

—মরণ রহিত সর্বব্যাপী (দেবী) রাত্রি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ ভাগ (উ), লতাগুল্ম (নিবতঃ) এবং বৃক্ষদিগকে (উদ্বত) অন্ধকারের দ্বারা পূর্ণ করেন। অতঃপর নিজের তেজের দ্বারা অন্ধকার বাধিত করেন।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ।[১]

—রাত্রি আগত হ'লে গ্রামসমূহে জনগণ শয়ন করে। পদযুক্ত গো অশ্ব সকল (পদ্বন্তো) শয়ন করে। শীঘ্র গমনকারী (অর্থিনঃ) শ্যেনেরা শয়ন করে। অথর্ববেদের ঊনবিংশ কাণ্ডে পাঁচটি সূক্তে রাত্রির বর্ণনা এবং বন্দনা আছে। এই সূক্তগুলি কাব্য হিসাবেও চিত্ত-চমৎকারী। ঋষি বলেছেন,

আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস তা ত্বেষং বর্ততে তম ॥[২]

—হে রাত্রি তুমি পার্থিবলোক দ্যুলোক এবং স্বর্গলোক অন্ধকারে পরিপূর্ণ কর। এইরূপে সর্বলোক ব্যাপ্ত ক'রে বিরাট তোমার অন্ধকার বিরাজ করতে থাকে।

ন যস্যাঃ পারং দদৃশে যোযুবৎ বিশ্বমস্যাং
নি বিশতে যদেজতি।
অরিষ্টাসমস্ত উর্বি তমস্বতি রাত্রি
পারমশীমহি ভদ্রে পারমশীমহি ॥[৩]

—যার পার দেখা যায় না, যা বিভক্ত হয় না, চঞ্চল প্রাণিজগৎ যাতে প্রবেশ করে (নিদ্রামগ্ন হয়), হে বিপুলে, হে তমোময়ি রাত্রি, সেই আঁধারের পারে আমাদের নিয়ে যাও, হে কল্যাণময়ি, আমাদের পারে নিয়ে যাও।

অথো যানি চ যস্মা হ যানি চান্তঃপরীণাহ
তানি তে পরি দদ্মসি।
রাত্রি মাতরুষসে নঃ পরিধেহি
উষা নো অহ্নে পরি দদাত্বহস্তভ্যং বিভাবরি ॥[৪]

১ ঋগ্বেদ—১০।১২৮।৫

২ অথর্ব—১৯।৬।৪৭।১

৩ ঐ—১৯।৬।৪৭।২

৪ ঐ—১৯.৬।৪৮।২

—যা কিছু আমাদের চতুর্দিকে আছে, সেই সবই রক্ষার জন্য তোমাকে দিচ্ছি। হে মাতঃ রাত্রি, প্রভাতকাল পর্যন্ত আমাদের পরিপালন কর। উষা দিবাভাগের জন্য আমাদের পরিপালন করুক। হে বিভাবরি, দিবাভাগ তোমার জন্য আমাদের রক্ষা করুক।

ইষিরা যোসা যুবতির্দমূনা রাত্রী দেবস্য সবিতুর্ভগস্য।
অশ্বক্ষভা সুহবা সম্ভৃত শ্রীরা পপ্রৌ দ্যাবাপৃথিবী মহিত্বা ॥[১]

—সর্বত্র ব্যাপনশীলা যৌবনবতী ভজনীয় সবিতৃদেবের পত্নী চক্ষুর নিরোধ-কারিণী, সুষ্ঠুভাবে হবনীয়া সম্পূর্ণকান্তি স্ব মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছেন।

অতিবিশ্বান্যরুহদ্ গম্ভীরো বর্ষিষ্ঠমরুহন্ত শ্রবিষ্ঠায়।
উশতী রাত্র্যনু ভদ্রাতি তিষ্ঠতে মিত্র ইব স্বধাভি ॥[২]

—গম্ভীরা রাত্রি বিশ্ব চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে বর্তমান, অতিশয় অন্নবতী (অথবা সকলের দ্বারা স্তুত) বহুতর অরণ্য পর্বতাদি ব্যাপ্ত করে আছেন। সূর্য যেমন স্বধা দ্বারা বর্ধিত হয়ে বিশ্ব ব্যাপন করেন, তেমনি রাত্রিও সব কিছু ব্যাপ্ত করে থাকেন।

বর্যে বন্দে সুভগে সুজাত আজগন্ রাত্রি সুমনা ইব স্যাম।
অস্মাংস্ত্রায়স্ব নর্যাণি জাতা অথো যানি গব্যানি পুষ্ট্যা।[৩]

—হে অপ্রতিহতপ্রভাবা, বন্দনীয়া, সৌভাগ্যবতী (অথবা সম্যকরূপে ভজনীয়া) সুজাতা রাত্রি, তুমি এসেছ, আমরা আনন্দিত হয়েছি। আমাদের রক্ষা কর; রক্ষা কর মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, উৎপন্ন ফসল ও গবাদি সম্পদ।

শিবাং রাত্রিমনু সূর্যং চ হিমস্য মাতা সুহবা নো অস্তু।
অস্য স্তোমস্য সুভগে নি বোধ যেন ত্বা বন্দে বিশ্বাসু দিক্ষু ॥[৪]

—কল্যাণকরী সূর্যানুরাগিণী, হিমের জননী রাত্রি আমাদের দ্বারা স্তুত হোন। হে সুভগে, আমাদের এই স্তোত্র গ্রহণ কর। সর্ব-দিগ্ব্যাপিনী তোমাকে বন্দনা করি।

---

১ অথর্ব ১৯।৬।৪৯।১
২ ঐ ১৯।৬।৪৯।২
৩ ঐ ১৯।৬।৪৯।৩
৪ ঐ— ১৯।৬।৪৯।৪

স্তোমস্থ নো বিভাবরি রাত্রি বাজেব জোষসে।

অসাম সর্ববীরা ভবাম সর্ববেদসো ব্যুচ্ছন্তীরনুষসঃ ॥[১]

—হে বিভাবরি, রাজা যেমন বৈতালিকের স্তুতি উপভোগ করেন, তুমিও তেমনি আমাদের এই স্তুতি গ্রহণ কর। তমোনিরাসকারী উষাতে আমরা বীর পুত্রমিত্রাদি লাভ করবো,, সকল ধন (বেদ) লাভ করবো।

ভদ্রাসি রাত্রি চমসোন বিষ্টো বিষ্বং গোরূপং যুবতির্বিভর্ষি।

চক্ষুষ্মতী মে উশতী বপুংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ন ক্ষামমুক্থাঃ ॥[২]

—হে রাত্রি, তুমি ভোজ্যপূর্ণ পাত্রের মত কল্যাণকরী, তুমি যৌবনবতী ধেনুর আকৃতি ধারণ কর। চক্ষুষ্মতী তুমি আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত দ্যুলোক ও পৃথিবী ত্যাগ কোরো না।

উষসে নঃ পরি দেহি সর্বান্ রাত্র্যনাগসঃ।

উষা নো অহ্নে আ ভজাদহস্তভ্যং বিভাবরি ॥[৩]

—হে বিভাবরি, আপাপবিদ্ধ আমাদের উষাকাল পর্যন্ত-ধারণ কর,—উষা তোমার নিমিত্ত সমস্ত দিন আমাদের পালন করুন।

রবীন্দ্রনাথ কৃত রাত্রিবর্ণনার সঙ্গে বেদের-রাত্রি-স্তুতির সাদৃশ্য সহজেই লক্ষিত হয়। প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবির মনোধর্মের স্বাজাত্য হেতুই বর্ণনার পার্থক্য সত্ত্বেও সাদৃশ্য সুগভীর।

রবীন্দ্রনাথ কৃত রাত্রি বর্ণনা :

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত স্বর।
শূন্যপানে—আরো কোথা? আরো কতদূর?[৪]

১ অথর্ব—১৯।৬।৪৯।৬

২ ঐ— ১৯।৬।৪৯।৮

৩ ঐ— ১৯।৬।৫০।৭।

৪ সন্ধ্যা—চিত্রা।

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথ বায়,
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দু-একটি তারা পড়িতেছে খসি।
শুধু এবে দলে দলে আঁধারের তলে।
আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা।[১]

আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়ে উড়িছে বাদুড়
কাঁদিছে পেচক—
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে
না পড়ে পলক।[২]

তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামা সুন্দরী।
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি।
নক্ষত্র রতন দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি সিংহাসনে
তোমার মহান জাগরণ।
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগরণতলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন।[৩]

১ নিশীথ চেতনা—ছবি ও গান।
২ নিশীথ জগৎ—ছবি ও গান।
৩ রাত্রি—কল্পনা।

আসিছে রাত্রি স্বপন ধাত্রী
বনবাণী হ'ল শান্ত—
জলভরা চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত—
নিখিলে ঘনালো দিবসের শোক
বাহির আকাশে ঘুচিল আলোক
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।[১]

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠ গৃহ-মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে
বিদ্যুৎ বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে।[২]

রাত্রি ও উষা সম্পর্কে কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন :

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।[৩]

রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা উষা ও রাত্রি বর্ণনায় এক আশ্চর্য সমুন্নত মহিমা লাভ করেছে,—যে সমুন্নতি অস্পর্শনীয়, বিস্ময়াবহ এবং অতুলনীয়। তথাপি

১ তুমি পরিশেষ।
২ তপোভঙ্গী—পূরবী।
৩ গীতিমাল্য—৫২।

এখানে বৈদিক মন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। নিদ্রিত জগতে রাত্রির জাগরণের রূপকল্পটি অথর্ববেদে দেখা যায় :

ত্বয়ি রাত্রি বসামসি স্বপিষ্যামসি জাগৃহি।[১]

কেবল রাত্রির জাগরণ নয়। কবিও জাগরিত থাকতে চান রাত্রির সঙ্গে। উপনিষদ বলেছেন, "যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জগর্তি সংযমী"—সকল প্রাণীর রাত্রিতে (নিদ্রিত থাকা কালে) সংযমী জাগ্রত থাকেন।

রাত্রিতে জাগ্রত থাকার অভিপ্রায় কবিও ব্যক্ত করেছেন :

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গনে।[২]

তপোভঙ্গ কবিতায় সর্পের রূপকল্পটি অথর্ববেদের একটি মন্ত্র থেকে পাওয়াও অসম্ভব নয়। অথর্ববেদ বলছেন,

পরিত্থামিব স্যর্যোহীনাং জনিমাগমম্ রাত্রি জগদিব…[৩]

—সূর্যের আকাশপ্রাপ্তির মত, রাত্রির জগৎ ব্যাপ্ত হওয়ার মত আমি সর্পকুল প্রাপ্ত হয়েছি।

অথর্ববেদ আর এক জায়গায় বলছেন, আপো বিদ্যুদভ্রং বর্ষং বোবন্ত সুদানব উৎসা অজগরা ইব।[৪]—মেঘস্থ জল, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি, অজগর তুল্য জলধারা তোমাদের রক্ষা করুক।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষা বর্ণনায়, বৈদিক বর্ষা বর্ণনা, মহর্ষি বাল্মীকি কৃত বর্ষা বর্ণনা এবং কালিদাসের বর্ষা বর্ণনার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়।

অথর্ববেদের বর্ষা বর্ণনাটি চমৎকার।

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ
সমভ্রাণি বাতজুতানি যন্তু।
মহাঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু॥

১ অথর্ব—১৯।৪৮।৭।
২ আহ্বান—পূরবী।
৩ অথর্ব—৬।১২।১
৪ অথর্ব ৪।৩।১৫।৪

সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবো-
২পাং রসা ওষধীভীঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ।।
সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং
বেসাগঃ পৃথগুদ্ বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ।।
গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু।।

* * *

অভিক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্গ্‌ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষ-

সং বোবন্তু সুদানব উৎসা অজাগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু।।
আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশো দিশঃ
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবী মনু।।১······

—মেঘাচ্ছন্ন দিকগুলি বায়ুর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ছুটে আসুক। জলপূর্ণ-মেঘগুলি বায়ুর সংগে যুক্ত হ'য়ে আসুক, মহাবৃষভের মত গর্জনকারী মেঘগুলি বায়ু দ্বারা চালিত হ'য়ে গর্জন করতে করতে বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক।। শোভনদানযুক্ত মরুৎগণ বৃষ্টিধারাকে দেখুক। বৃষ্টির রস ওষধির মাধ্যমে পৃথিবীকে অভিষিক্ত (শস্যশালিনী) করুক। এই বর্ষণ পৃথিবীকে পুজা করুক,—পৃথিবীর সৌন্দর্য-বর্ধনকারী ওষধিসমূহ পৃথক পৃথক জাত হোক॥

হে স্তবগানকারী। আমাদের জলপূর্ণ মেঘগুলি দেখাও, বেগবান্ বর্ষণ পৃথকভাবে চলুক। বৃষ্টিধারা ভূমিকে মহনীয় করুক,—নানারূপ ওষধি জন্মাক।

১ অথর্ব—৪।১৫।১—৪, ৬—৮।

* (শস্যশালিনী)

হে পর্জন্যদেব গর্জনকারী মরুৎগণ তোমার নিকটে গান করুক। বর্ষার বৃষ্টিধারাগুলি পৃথিবীকে সিক্ত করুক ॥ হে পর্যন্য, তুমি গর্জন কর, মেঘগুলিকে শব্দযুক্ত কর, ভূমিকে জলদ্বারা সিক্ত কর তোমার সৃষ্ট বর্ষণসমর্থ মেঘগুলি ছুটে আসুক। বর্ষণকামী (সূর্য) কৃশ গরুর ন্যায় অস্তগমন করুক ॥ শোভন-দানশীল তোমাদের মঙ্গল দান করুন। অজাগরের মত স্থুল বারিধারা নেমে আসুক। মরুদ্‌গণ দ্বারা প্রেরিত মেঘসকল পৃথিবীতে বর্ষণ করুক। দিকে দিকে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হোক। বায়ু দিকে দিকে প্রবাহিত হোক, মরুদ্‌গণের দ্বারা চালিত মেঘ পৃথিবীতে নেমে আসুক ॥

ঋগ্বেদের বর্ষা বর্ণনা :—

সত্যং ত্বেষা অমবংতো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ।
মিহং কৃন্বংত্যবাতাং ॥
বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।
যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ॥
দিবা চিত্তমঃ কৃন্বংতি পর্জন্যেনোদবাহেন।
যৎপৃথিবীং ব্যুংদংতি ॥
অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবং।
অরেজংত প্র মানুষঃ ॥
মরুতো বীলুপাণিভিশ্চিত্রা বোধন্বতীরনু।
যাতেমখিদ্রয়া মভিঃ ঃ ॥[১]

—দীপ্তিমান্ ও বলবান্ রুদ্রিয়গণ সত্যই মরুভূমিতেও বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন। প্রশ্রুত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুৎগণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরুৎগণ বৃষ্টি দান করিলেন। মরুৎগণ উদকধারী মেঘের (পর্জন্য) দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন। মরুৎগণের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি সমস্তাৎ কম্পিতা হয়, মনুষ্যগণ কম্পিত হয়। হে মরুৎগণ! দৃঢ়হস্ত দ্বারা বিচিত্র তটযুক্ত (নদী) দিয়া অপ্রতিহত গতিতে গমন কর ।[২]

১ ঋগ্বেদ—১।৩৮।৭—১১।

২ ঐ — অনুবাদ ৺রমেশ দত্ত।

যদ্যুংজাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন
নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতং।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং
বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥১

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করিতেছ, তখন মধুর জলধারা আমাদিগের বল বর্ধিত কর। আমাদের লোকজনকে অন্ন দ্বারা প্রীত কর। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধন প্রাপ্ত হই।২

মহর্ষি বাল্মীকি বর্ষার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন:

বিদ্যুৎ পতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্র কূটাকৃতি সন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সং যুগস্থাঃ ॥
বর্ষোদকাপ্যায়িত শাদ্বলানি
প্রবৃত্ত নৃত্যোৎসব বর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি ॥
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারম্
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাম্
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রযান্তি ॥
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য ॥

* * *

নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি ॥

১ ঋগ্বেদ—২।২৫৭।২।
২ ঐ—অনুবাদ—৺রমেশ দত্ত।

দাতা বনান্তাঃ শিখিসু প্রনৃত্যা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
জাতা মহীশস্য বনাভিরামা ।।
বহন্তি বর্ষান্ত নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ ।।
প্রহর্ষিতা কেতকী পুষ্প গন্ধ-
মাঘ্রায় মত্তা বননির্ঝরেষু ।
প্রপাতশব্দাকুলিতা গজেন্দ্রাঃ
সার্দ্ধং ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি ।।
ধারানিপাতৈরভিহন্যমানাঃ
কদম্ব শাখাসু বিলম্বমানাঃ ।
ক্ষণার্জিতং পুষ্পরসাবগাঢ়ং
শনৈর্মদং ষট্‌চরণাস্তজন্তি ।।[১]

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাবর্ণনা আর্য বর্ণনার অনুরূপ না হ'লেও সমগোত্রীয়। ঋষি কবির বর্ণার সংঙ্গে সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ না হ'লেও দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ;
নিখিল চিত্তহরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

বাল্মীকি রামায়ণ—কিষ্কিন্ধা কাণ্ড ২৮ সর্গ ২০—২৩, ২৫—২৯।

স্নিগ্ধ সজলে মেঘ কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে
শশিতারাহীন অন্ধ তামসী যামিনী—
কোথা তোরা পুরকামিনী !
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী—
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী !
যূথি পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না—
নিপশাখে বাঁধো ঝুলনা।

*   *   *

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।............[১]

দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা হইয়া আসে ঘোরালো,
সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।
চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টিজল
এই ছোটো প্রান্ত ঘরটিরে
দেয় নির্বাসিত করি দশদিক অপহরি
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে।..........[২]

১ বর্ষামঙ্গল—কল্পনা।

২ বর্ষাযাপন—সোনারতরী।

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।.........১

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে গরজে
গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।.........২

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ষা বর্ণনায় ঋষি কবির সঙ্গে মহাকবি কালিদাস এবং বৈষ্ণব কবিদের কণ্ঠস্বর ও শোনা যায়।

উপনিষদের— শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ ।।৩

১ গীতাঞ্জলি—২৭।

২ ক্ষণিকা—নববর্ষা।

৩ শ্বেতাশ্বতর—২।৫

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদতেঽয়নায়।[১]

মন্ত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথের একটি চতুর্দশপদী কবিতায় অনূদিত হয়ে কবিচিত্তকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের অনুধ্যানে নিয়োজিত করেছে।

একদা এ ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, শোনো বিশ্বজন
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পথ চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি।

উপনিষদের মন্ত্রকে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ ঋষি কবির মতই বাঙ্গালা দেশে বৈদিক মন্ত্র প্রচারের ভার নিয়েছেন এবং বর্তমান ভারতবর্ষ বৈদিক ঋষির অমৃতমন্ত্র বিস্মৃত হ'য়ে অন্ধ তামসে নিমজ্জিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন।

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা-আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃত বার্তা।
রে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে নাহি অন্যপথ।[২]

নৈবেদ্য কাব্যে কবি উপনিষদের আত্মজ্ঞানের আনন্দময়, জ্যোতির্ময় লোকে বিচরণ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক

১ শ্বেতাশ্বতর—৩।৮
২ নৈবেদ্য—৬০।

সভ্যতার প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ও ভারতীয় তপোবনে লব্ধ জ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে সর্বভূতের অন্তরবাসী আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতে কবিচিত্ত রয়েছে উন্মুখ হয়ে ; কখনও বিশ্বের সর্বত্র এবং নিজের দেহের চেতনার অণুতে অণুতে তাঁর লীলা মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন।

অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক-লোকান্তরে
অনন্ত শাসন যাঁর চিরকাল তরে
প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ,
যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস
বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর 'পর
যাঁর তর্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর
আমার চৈতন্য মাঝে প্রত্যেক পলকে
করিছেন অধিষ্ঠান—তাঁহারি আলোকে
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে।
যেথা চলি, যেথা রহি, যেথা বাস করি,
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে মোর এই কথা স্মরি
আপন মস্তক পরে সর্বদা সর্বথা
বহিব তাঁহার গর্ব নিজের নম্রতা।[১]

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।[২]

উপনিদ্ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন, "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।"[৩] -তিনি চলেন না,—তিনি দূরে, তিনি নিকটে।

১ নৈবেদ্য—৭৬।
২ ঐ —৭৫।
৩ ঈশ—৫।

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।"[১]—তিনি দূর হ'তে ও দূরে, তিনি নিকটে এখানেই বর্তমান। মন্ত্রদুটির ভাষ্য শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে।

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি, সেথা তুমি মম
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানাভাবে নিত্য নব নব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে। তব গান
জল স্থল শূন্য হতে করিছে আহ্বান
মোরে সর্ব কর্ম মাঝে—বাজে গূঢ়স্বরে
প্রহরে প্রহরে চিত্ত কুহরে কুহরে
তোমার মঙ্গল মন্ত্র।.........

কাছে তুমি কর্মতট আত্মা তটিনীর
দূরে তুমি শান্তি সিন্ধু অনন্ত গভীর।[২]

কবি বলছেন, অসীম তপস্যা করেন মানুষের সীমায় ধরা দেবার জন্য।[৩] উপনিষদও বলছেন, "স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত ?"[৪]

নৈবেদ্যের অপর একটি কবিতায় উপনিষদের তিনটি মন্ত্র সক্রিয় প্রেরণারূপে কাজ করেছে :

তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্ব চরাচরে
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ নির্ঝর।
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিনরাত
চরাচরে মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

১ মণ্ডুক—৩।১।৭।
২ নৈবেদ্য—৮৩।
৩ আমি—শ্যামলী।
৪ তৈত্তিরীয়—অনুবাক—৬।

গিরি উঠিয়াছে উর্ধ্বে তোমারি ইঙ্গিতে
শূন্যে শূন্যে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ, তারা যত
সমস্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।[১]

এই কবিতাটির প্রথম দুই ছত্রে "আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" মন্ত্রটির এবং শেষ দুই ছত্রে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" মন্ত্রটির ছায়া পড়েছে। মধ্যের ছত্র কয়েকটি কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটির ভাষ্য।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি-ভয়াত্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।[২]

এই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্বল্প পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা যায়।

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য ঃ
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।[৩]

কখনও কবি ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন তাঁকে একান্ত ক'রে পাওয়ার জন্য। সেই মহান্ত পুরুষকে পাওয়া সম্ভব হয় ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা—শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা নয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।[৪]

—এই আত্মা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না—মেধা কিম্বা বহুল শাস্ত্র শ্রবণে ও লাভ করা যায় না। যিনি তাঁকে সম্বরূপে বরণ করেন (অথবা ভক্তিভরে কামনা করেন) তাঁর দ্বারা এই আত্মা লভ্য হন। এই আত্মা তাঁর নিকটে স্বকীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে পেতে চেয়েছেন প্রেম ও ভক্তির দ্বারা। কবির আত্মচিন্তায় ঔপনিষদিক জ্ঞানের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম তথা ভক্তিবাদের সমন্বয় ঘটেছে। কবি তাঁকে পরম আত্মীয়রূপে পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

১ নৈবেদ্য—৫৮।
২ কঠ—২।২।৩
৩ তৈত্তিরীয়=৮ম অনুবাক।
৪ কঠ ১।২।২৩

তোমারে বলেছে যারা, পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর—তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।
সে সরল শান্তপ্রেম গভীর উদার—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয় সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা মাঝে
গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী,
কেমনে করিব লাভ। পদে পদে আমি
প্রেমের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে
অন্তরে টানিয়া লব নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে;[১]

কবির অন্তরলোক প্রেম ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ। নৈবেদ্য—গীতাঞ্জলি—গীতিমাল্য—গীতালিতে আত্মজ্ঞান ও প্রেমভক্তির সমন্বয় সর্বত্র। আত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলে ঘোষণা করেছিলেন উপনিষদের ঋষি। সেই ঘোষণাই উক্ত কবিতাবলীর উপজীব্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রা প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।............ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।"[২]—অরে মৈত্রেয়ী! জায়া পতির প্রীতি-সাধনের জন্য পতিকে ভাল বাসে না, কিন্তু কেবল আত্মার প্রীতি-সাধনের জন্য পতিকে ভালবাসে। এইরূপে পতি যে জায়াকে ভালবাসে তাও জায়ার প্রীতির জন্য নয়, কেবল আত্মার প্রীতি-সাধনের জন্য। পুত্র সকলের প্রীতির জন্য পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় না; আত্মার প্রীতির জন্যই পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়। বিত্তের প্রীতি-সাধনের জন্য

১ নৈবেদ্য—

২ বৃহদারণ্যক—২ অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ—৫।

বিত্তসকল প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত বিত্ত মনুষ্যের প্রিয়। ....সকল দ্রব্যেরই প্রীতি সাধনের জন্য তারা প্রিয় হয় না। আত্মার প্রীতির জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।

এই কথাই আরও সংক্ষেপে বলা হয়েছে, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।[১]"—সকলের অন্তরতর এই আত্মা পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়।

ঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে আত্মাই সর্বব্যাপী হ'য়ে প্রিয়জন রূপে প্রকাশ পান,—তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী—সকল প্রিয়জন। "প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা, প্রাণো ভ্রাতা, প্রাণ স্বসা, প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।"[২]

ঋগ্বেদ বিশ্বকর্মা প্রজাপতিকে পিতারূপে বর্ণনা করেছেন:

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি
বেদ ভুবনানি বিশ্বা।'[৩]

—তিনি আমাদের পিতা, উৎপাদক (জন্মদাতা), তিনি সকল জগতের উৎপাদক—তিনি দেবতাদের বাসভূমি জানেন,—বিশ্বভুবন সবই জানেন।

অথর্ববেদও সর্বজ্ঞ সর্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে পিতা, জনিতা ও বন্ধুরূপে বর্ণনা করেছেন:

স নঃ পিতা, জনিতা, স উত বন্ধুর্ধামানি বেদ
ভুবনানি বিশ্বা।[৪]

যজুর্বেদেও তিনি পিতা: পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর কখনও বন্ধু কখনও পিতা, কখনও প্রিয়—কখনও রাজা—কখনও প্রভু।

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম,.......................।[৫]

১ বৃহদারণ্যক—১ অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ—৮।

২ ছান্দোগ্য—৭ অঃ ১৫ খঃ ১ (৫৪৮)।

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৩।

৪ অথর্ব—২।১।৩।

৫ নৈবেদ্য—৮২।

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হ'য়ে রহিয়াছে সকল দিবস
প্রাণেশ্বর...... .... ।[১]

নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত
পিতৃরূপে রয়েছেন তিনি পিতৃমাঝে
নমি তাঁরে ।.........[৩]

মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু।
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়।[৪]

এ বিশ্ব ভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে গোপনে
আপন মহিমা মাঝে।[৫]

তুমি তবে এসো নাথ বসো শুভক্ষণে
দেহে মনে গাঁথা এই মহা সিংহাসনে।[৬]

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন [৭]

১ নৈবেদ্য—৭৫।
২ ঐ —৭২।
৩ নৈবেদ্য—৭৯।
৪ ঐ —৪৪।
৫ ঐ —৪১।
৬ ঐ —২৮।
৭ ঐ—৩৬

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো প্রভু
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।[১]

নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে।[২]

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী।[৩]

গর্ব করে নিইনে ও নাম, ওগো অন্তর্যামী।[৪]

আজি, ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।[৫]

তোমার বাণী নয় হে বন্ধু, হে প্রিয়।[৬]

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে।[৭]
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনি কাটিবে স্বামী।
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো।[৮]

১ নৈবেদ্য—৫
২ গীতাঞ্জলি—১৪৪
৩ নৈবেদ্য—৩।
৪ গীতাঞ্জলি—১১১।
৫ ঐ —২০।
৬ ঐ
৭ ঐ—৬
৮ গীতালি—৫০

ঈশ্বরকে পিতৃরূপে বর্ণনা করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বারংবার যজুর্বেদের মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন। "ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটা মন্ত্র হচ্ছে: পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র: তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে: তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে: তুমি পিতা। এই যে যোগ এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনা—পাওনা।...... তাই আমার প্রার্থনা এই যে: পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও।।[১]

"পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। নমস্তেঽস্তু। যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা: তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।......সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে। কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করেছে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুই-ই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে।[২]

'পিতা নোঽসি' মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাতে ও রূপ পেয়েছে।

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোনো না রোষ।[৩]

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চিন্তায় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাবও যথেষ্ট। বৈষ্ণবদর্শনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা—প্রেম সাধনার এই পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা হইয়েছে।

অধিকার ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর।[৪]

---

১ নমস্তেঽস্তু—শান্তিনিকেতন।
২ দ্বিধা—ঐ।
৩ পূজা—৩৯২
৪ চৈতন্য চরিতামৃত।

পঞ্চরতির মধ্যে মধুর রতি সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বকীয়া-পরকীয়া ভেদে মধুর রতি দ্বিবিধ।

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর রস শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য।

*　　*　　*

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥[১]

বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তিই প্রধান। ভক্তির গাঢ়তর অবস্থা প্রেম।

সাধন ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।[২]

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।[৩]

ঈশ্বরে অনুরক্তি দিনের পর দিন বর্ধিত হয়। এই অনুরাগ অসীম অনন্ত। এই প্রেম-সাধনা সম্পর্কে বৈষ্ণব কবি লিখেছেন:

থাইতে শুইতে রৈতে　　　আন নাহি লয় চিতে
বঁধু বিনা আন নাহি ভায়।[৪]
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।[৫]
কৃষ্ণের মাধুর্য হয় অমৃতের সিন্ধু
মোর মন সন্নিপাতী সব পিতে করে মতি
দুর্দৈব না দেয় এক বিন্দু।[৬]

রাধাভাব বিভাবিত মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহে কাতর হ'য়ে বলছেন:

যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।[৭]

১—৩ চৈতন্য চরিতামৃত।
৪ মুরারী গুপ্ত।
৫ রায় রামানন্দ।
৬ চৈতন্য চরিতামৃত।
৭ চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

বৈষ্ণব ভক্তের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণময়। "যাঁহা যাঁহা নেত্র স্ফুরে তাঁহা কৃষ্ণমূর্তি।"

রবীন্দ্রকাব্যে বেদ, উপনিষদ এবং বৈষ্ণব দর্শনের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। বৈষ্ণব সাধনার ঐকান্তিক অনুরাগ, প্রেমভক্তির বশীভূত প্রেমময় ভগবানে গভীর বিশ্বাস এবং উপনিষদের সর্বভূতাধীশ পরম ঐশ্বর্যময় ব্রহ্মের জ্ঞান একত্রিত হ'য়ে ভগবৎ লীলার আস্বাদনে একাগ্র করেছে খেয়া—গীতিমাল্য—গীতাঞ্জলি—গীতালির কবিকে। নৈবেদ্যেও এই জ্ঞানও প্রেমের মিশ্রণ অস্পষ্ট নয়।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিঠুর
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে
দিবানিশি তাইত বাজে
পরাণ মাঝে এমন কঠিন সুর।[১]
তোমার ভুবন মর্মে আমার লাগে
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।
এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে সরস
রক্ত আমার রাঙিয়ে আছে
তবু অরুণ রাগে।[২]
এই করেছ ভালো নিঠুর
এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে

১ গীতালি—৮।
২ ঐ—৬৮।



আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।[১]
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ।[২]

এই কবিতাগুলি অনুধাবন করলে বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি এবং ঔপনিষদিক আত্মজ্ঞানের মিশ্রিত প্রকাশ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। বৈষ্ণবীর মধুর রতি বা কান্তাভাবে ভজনের প্রভাব ও রবীন্দ্র কাব্যে কম নয়। অনেক জায়গায় কবি নিজে কান্তারূপে ঈশ্বরকে কান্তজ্ঞানে ভজনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে কান্তাভাবের উদাহরণ ভূরি ভূরি মিলবে।

রুদ্ধ দুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার
এবার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণ বঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরাণে পরশ মধু।[৩]
তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
করব না আর সাজ
নাইবা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয় রাজ
আমি করবো না আর সাজ

১ গীতাঞ্জলি—৩১।
২ নৈবেদ্য—২৭।
৩ মুক্তিপাশে—খেয়া।

ধূলায় বসে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে
তোমার লাগি ঘরে পরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারী আমায়
সাজিয়ে দিল আজ—
আমি করব না আর সাজ।[১]

নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
এসেছ হৃদয় পুলিনে।
ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে
ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলিনে।[২]

ওগো বর ওগো বঁধু
জান জান তুমি, ধূলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধু।
রতন আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দন-বন মধু।
ওগো বর ওগো বঁধু।[৩]

কখনও দেখি পদাবলীর রাধার মত—রাধাভাব তন্ময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মত রবীন্দ্রনাথ তীব্র বিরহ দুঃখ ভোগ করছেন ঈশ্বর-কৃপা বঞ্চিত হ'য়ে।

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো
র'য়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ, সে যে ভালো।[৪]

১ দান—খেয়া।
২ উৎসর্গ—৫
৩ বালিকা বধু—খেয়া
৪ গীতাঞ্জলি—১৭।

কখনও দয়িতের দর্শন লাভের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় কবির রাত্রি জাগরণ চলে বিরহিণী ব্রজবধূর মত।

পথ চেয়ে কাটল নিশি
লাগছে মনে ভয়—
সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়।
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ার দেশে!
বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছে তো তার জানা—
ওগো, তোরা পথ ছেড়ে দিস্
করিস্ নে কেউ মানা।[১]

কান্তাভাবে ঈশ্বর ভজনার এমনি বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্ররচনার নানা স্থানে। অবশ্য বৈষ্ণবের কান্তাপ্রেম তথা রবীন্দ্রনাথের কান্তারূপে ভজনের উৎস উপনিষদেই আছে। উপনিষদে যা ছিল বীজরূপে,—বৈষ্ণব কাব্যে দর্শনে তাই হয়েছে পল্লবিত,—সঞ্জীবিত,—সরসিত। উপনিষদে আছে: "তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবং অয়ং পুরুষঃ আত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।"[২]—যেমন প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে বাহ্য এবং আন্তর জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তেমনি এই পুরুষ জ্ঞানী আমার দ্বারা আলিঙ্গিত হ'য়ে আন্তর ও বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবনা সম্পর্কে এক সুধী সমালোচক লিখেছেন, "তাঁর মন চেয়েছে সর্বেশ্বর-বাদের গলায় বরমাল্য দিতে। অপরপক্ষে হৃদয় চেয়েছে এমন একটা কিছু ব্যবস্থা, যার দ্বারা দেবতাকে প্রিয়ভাবে পাওয়া যেতে পারে এ যেন উপনিষদের সর্বেশ্বর-বাদের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের মধুর রসের ভিত্তিতে সাধনার দ্বন্দ্ব।"[৩]

১ জাগরণ,—খেয়া।

২ বৃহদারণ্যক—১।৩।২১।

৩ রবীন্দ্র দর্শন—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন কোন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট পুজানুষ্ঠান বা রূপধ্যানের মধ্য দিয়া নহে, কিন্তু পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে তাঁহার চকিত প্রকাশে, এক ক্রিয়াশীল অদৃশ্য সত্তার মুহুর্মুহু আবির্ভাব—অন্তর্ধান-লীলার লুকোচুরিতে, কখনও কখনও একান্ত ভক্তি-বিহ্বল আত্ম-নিবেদনের মাধ্যমে।·········এই ভগবদ্ ভক্তিমূলক গানগুলিতে কবির মনে উপনিষদের চেতনা ও আধুনিক মনের প্রকৃতি-প্রীতির ও ভাব-বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে আকাশরূপে কল্পনা করেছেন। খেয়ার নীড় ও আকাশ কবিতা স্মর্তব্য। নৈবেদ্যের ৮২নং কবিতায় কবি ঈশ্বরকে বলেছেন,

"একাধারে তুমিই আকাশ, তুমিই নীড়।"

উপনিষদেও আকাশ ভূমা বা ব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত হয়েছে। "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বাহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।"[২]

—আকাশ শব্দ বাচ্য ব্রহ্মই নাম ও রূপের নির্বাহক (কর্তা)। সেই নামও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত এবং তাহাই আত্মা।[৩]

"সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"[৪]

—স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত এই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়, এবং যেহেতু আকাশই সর্বাপেক্ষা অতিশয় মহান, আকাশই পরম আশ্রয়।[৫]

কবি বিহারীলাল ও আকাশকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করেছেন:

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ;
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য তোমার
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।[৬]

১ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।
২ ছান্দোগ্য—৮ অঃ ১৪ খঃ।
৩ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।
৪ ঐ ১ „ ৯ „
৫ ঐ ঐ
৬ সাভোমণ্ডল—নিসর্গসন্দর্শন।

নৈবেদ্যের অপর একটি কবিতাতে ও রবীন্দ্রনাথ আকাশকে ব্রহ্মের প্রতিরূপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, যেথা শুভ্র ভাস ;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই,—নাই নাই বাণী।

আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যায় এই কবিতাংশের শেষ দুই ছত্রে কবি যে নিরাকারের বর্ণনা করেছেন, তাতেও উপনিষদের ছায়া সুস্পষ্ট। উপনিষদ বলেন,

"ন বৈ তত্র নিম্লোচ নেদিয়ায় কদাচন।"[২]

—সেখানে সূর্য কখনও অস্তমিত হন নি—এবং উদিত ও হন নি।

কঠ এবং মণ্ডুকোপনিষদ বলেছেন :

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নি : ॥[৩]

—সেখানে সূর্য ও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও প্রকাশ পায় না,—বিদ্যুৎ ও প্রকাশ পায় না। এই অগ্নি আর কি করবে?

পুরাণে সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পাই :

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানু পলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাং তদাসীৎ ॥[৪]

—আত্মার নিরাকার রূপের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অপর এক স্থানে লিখেছেন :

সেখানে অখণ্ড দিন
আলোকহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।[৫]

১ নৈবেদ্য—৮১।
২ ছান্দোগ্য—৩।১১ ২ (২২৩)।
৩ কঠ—২।২।১০। মণ্ডুক ২।২।১৫।
৪ বিষ্ণু পুরাণ—২য় অধ্যায় ২৩।
৫ জন্মদিনে—১২।

উপনিষদের ব্রহ্ম বিরাট—বৃহত্তম আবার ক্ষুদ্র অনুতম ও। 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্;'—তিনি ব্রহ্মপরং বৃহন্তং' আবার 'অনুভ্যাহণু'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে
অনু হতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহীয়ান্,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।[১]

উপনিষদের ব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে।......

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি।

রূপাতীত সেই অসীম একা তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি আপনাকে দ্বিধা করলেন—স আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর "আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ।" তিনি রূপে রূপে ধরা দিলেন—রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব। আমাদের কবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে "অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে।"[২]

পরমাত্মা থেকে জীবলোকের প্রকাশ সম্পর্কে ঋষি উর্ণনাভির উপমা প্রয়োগ করেছেন : "স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব সেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"[৩]

শ্রুতি অন্যত্র বলেছেন,

যন্তুর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো
দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥[৪]

১ বর্ষশেষ—পরিশেষ।
২ গীতাঞ্জলি।
৩ এই গ্রন্থের ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৪ শ্বেতাশ্বতর—১০

—উর্ণনাভ যেমন স্বদেহ থেকে নির্গত তন্তু দ্বারা নিজেকে আবৃত করে, পরমেশ্বর ও স্বীয় অনির্বচনীয় শক্তি প্রভাবে নিজেকে গুপ্ত রাখেন।

কবিও নিজের মধ্যে অনুরূপ সৃষ্টির ক্রিয়া অনুভব করেছেন।

একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম চলিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।[১]

ঋষির মুখোচ্চারিত ঐ একই কথা উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে অন্য এক ক্ষেত্রে। "মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগত বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে।"[২]

উপনিষদের ঋষি প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে বলেছেন, ব্রাত্য। "ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।[৩]—হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য (সংস্কারাদি রহিত), একর্ষি নামক অগ্নিরূপে হবির্ভোক্তা, তুমি বিশ্বের সৎপতি (সকল বিদ্যমান বস্তুর পতি)।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরম-আত্মার সঙ্গে অভিন্নজ্ঞানে নিজেকে ব্রাত্যরূপে অভিহিত করেছেন।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য—আলোর প্রকাশ
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য—আমি মন্ত্রহীন।[৪]

১ নৈবেদ্য—২৭

২ সৌন্দর্যের সম্বন্ধ,—পঞ্চভূত।

৩ প্রশ্ন—২।১১।

৪ পনেরো—পত্রপুট।

অথর্ববেদে পৃথিবীকে জননী বলা হয়েছে :

তাস্থ নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিং
পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।[১]

—তাহাতে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর, পবিত্র কর ;—হে মাতা ভূমি, আমি পৃথিবীর পুত্র।

বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা ॥[২]

—বিশ্বের প্রসবিত্রী, ওষধিগণের মাতা ধ্রুবা ভূমি ধর্মের দ্বারা ধৃতা, শিবা এবং সুখদা পৃথিবীতে আমরা বিচরণ করিব।

যাসাংদ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব।[৩]

—যাদের দ্যুলোক পিতা পৃথিবী মাতা, সমুদ্র ওষধীর মূল।

যজুর্বেদে আছে :

"উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা হ্বয়তাং…… ।[৪]

—সকলের উপাস্যা এই পৃথিবী জননী স্থানীয়া, মাতা পৃথিবী আমাকে আহ্বান করুন।

রবীন্দ্রকাব্যে নিজের দেশ জন্মভূমি ত জননীরূপে বন্দিতা হয়েছেই,—পৃথিবীও বারে বারে জননীর গৌরব লাভ করেছে। 'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় পৃথিবী মানুষের মাতা ও সমুদ্র বিমাতারূপে বর্ণিত হয়েছে।

কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল।
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল।

'অহল্যার প্রতি' কবিতাতেও পৃথিবী জননী।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপ তাপ রেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা।

১ অথর্ব—১২।১।১২
২ ঐ—১২।১।১৭
৩ ঐ—৬।২।২০।২
৪ শুক্লযজুর্বেদ—২।১০।১০

সোনারতরীর 'বসুন্ধরা' কবিতায় বসুন্ধরা জীবধাত্রী জননী এবং 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় সমুদ্র 'আদি-জননী' (মাতামহী) এবং পৃথিবী কবি তথা জীবকুলের জননী। সমুদ্রের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন,

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,......[১]

পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বল্‌ছেন :

ওগো মা মৃণ্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;[২]

অথর্ববেদে জলকে মাতা বলা হয়েছে : আপো অস্মান্ মাতরঃ।[৩]

সমুদ্রের প্রতি কবিতায় সমুদ্রের গর্ভধারণের রূপকল্পটি যে বৈদিক মন্ত্র থেকে পাওয়া—তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে।[৪] অথর্ববেদে জলের গর্ভধারণের উল্লেখ রয়েছে : "দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং বৃষভমোষধীনাম্।"[৫]—ওষধিগণের বৃদ্ধিকর জলের মহান গর্ভ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরাকে কামধেনুরূপে কল্পনা করেছেন। এই রূপকল্পটি বেদে এবং পুরাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু
তোমারে সহস্ররূপে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত ,[৬]

ঋগ্বেদে আছে : "ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য"[৭]—রশ্মিগণ তাঁহার (সূর্যের) ক্ষীর দোহন করেন। অথর্ববেদ বলেছেন :

অস্মৈ দ্যাবা পৃথিবী ভূরি বামং
দুহাথাং ঘর্মদুঘে বৈ ধেনু।[৮]

—হে দ্যাবাপৃথিবী, বহুক্ষীরা গাভী যেমন প্রভূত দুগ্ধ দান করে, সেইরূপে তোমরাও আমাদের রাজাকে প্রভূত ধন দান কর।

---

১ সমুদ্রের প্রতি—সোনারতরী।
২ বসুন্ধরা— ঐ ।
৩ অথর্ব ৬।৫।২১।৫
৪ এই গ্রন্থের ৫৮।৫৯ পৃ: দ্রষ্টব্য।
৫ বসুন্ধরা—সোনারতরী।
৬ ঋগ্বেদ—১ ১৬৪।৭।
৭ অথর্ব—৭।৪।৪১।৭।
৮ অথর্ব ৪।২২।৪

অথর্ববেদ আরও বলেছেন: "পৃথিবী ধেনুস্তস্যা অগ্নির্বৎস! সা মেগ্নিনা বৎসেনেব ভূর্জং কামং দুহাম্।"[১]—পৃথিবী ধেনু, তার বৎস অগ্নি। সেই অগ্নির সাহায্যে আমি বলকর অন্ন দোহন করি।

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, বেণ রাজার পুত্র পৃথু ধেনুরূপিণী বসুন্ধরাকে দোহন করেছিলেন। সেজন্য বসুন্ধরার নাম হয়েছিল পৃথিবী। এই উপাখ্যানের মূল রয়েছে অথর্ববেদে: তস্য মনুর্বৈবস্বতো বৎস আসীৎ পৃথিবী পাত্রম্ তাং পৃথী বৈন্যোঽধোক্ কৃষিং চ শস্যং চাধোক্।[২]

বিষ্ণু পুরাণ বলছেন:

স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ॥
শস্যজাতানি সর্বাণি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ॥
প্রাণ প্রদানাৎ স পৃথুর্যস্মাদ্‌ভূমেরভূৎ পিতা।
ততস্তু পৃথিবীসংজ্ঞামবাপাখিলধারিণী॥

অতঃপর দেবদৈত্য-রক্ষ-যক্ষ-মানব প্রভৃতি সকলেই পৃথিবীকে দোহন করে:

ততশ্চ দেবৈর্মুনিভির্দৈত্যৈ রক্ষোভিরদ্রিভিঃ।
গন্ধর্বৈরুরগৈর্যক্ষৈঃ পিতৃভিস্তরুভিস্তথা॥
তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তৎ তদ্ দুগ্ধা মুনে পয়ঃ।[৩]

পদ্মপুরাণেও আছে এই উপাখ্যান:

স্বায়ম্ভুবো মনুর্বৎসঃ কল্পিতস্তেন ভূভুজা।
স্বপাণিঃ কল্পিতস্তেন পাত্রমেবং মহামতে॥
স পৃথুঃ পুরুষব্যাঘ্রো দুদোহ বসুধাং তদা।
সর্বশস্যময়ং ক্ষীরং সসর্বান্নং গুণান্বিতম্॥

অতঃপর আর আর সকলেই পৃথিবীকে দোহন করে:

ঋষিভিশ্চৈব মিলিতৈর্দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা।
পুনর্বিপ্রৈর্মহাভাগৈঃ সত্যবদ্ভিঃ সুরৈস্তথা॥

১ অথর্ব ৪।৮।৩৯।২

২ ঐ ৮।৫।১৬।১০-১১

৩ বিষ্ণুপুরাণ—প্রথমাংশ, ১৩ অঃ ৮৬-৮৯।

সোমো বৎসস্বরূপোঽভূদ্দোগ্ধা দেবগুরুঃ স্বয়ম্।
ঊর্জং ক্ষীরং পয়ঃ কল্পং যেন জীবন্তি চামরাঃ ॥
তেষাং সত্যেন পুণ্যের সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
সত্যপুণ্যে প্রবর্তন্তে ঋষি দুগ্ধা বসুন্ধরা ॥
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা দুগ্ধা বসুন্ধরা।
পিতৃভিশ্চ পুরা বৎস বিধিনা যেন বৈ তদা ॥[১]

মহাকবি কালিদাসও হিমালয় বর্ণনা প্রসংগে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং
মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ
পৃথুপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্।[২]

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে দেখা যায় যে ঋষি কবি পৃথিবী থেকে জাত গন্ধের দ্বারা নিজ দেহ সুরভিত করতে চেয়েছেন:

যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব
যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরশ্চ ভেজিরে
তেন মা সুরভিং কৃণু মানো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥[৩]

—যে গন্ধ তোমা থেকে উদ্ভূত, যে গন্ধ বহন করে ওষধি এবং ভোগ করে অপ্সরাবৃন্দ,—হে পৃথিবী সেই গন্ধ দিয়ে তুমি আমাকে সুরভিত কর, কেউ যেন আমাদের দ্বেষ না করে।

রবীন্দ্র-রচনায় মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি শোনা যায়:

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদ ধান্যে যে আভা বাতাসে নাচে,
কিরণে কিরণে হাসিত হিরণে হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া……[৪]

১ পদ্মপুরাণ—ভূমিখণ্ড, ২য় অঃ, ৩৩—৩৪, ৪১—৪৪
২ কুমারসম্ভব—১ম সর্গ—২।
৩ অথর্ব—১২।১।২৩
৪ উৎসর্গ—২১।

অথর্ববেদের ঋষি সর্বব্যাপী অগ্নির প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলেন :

অগ্নি ভূম্যামোষধীষগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু
অগ্নিরন্তঃ পুরুষেষু গোষশ্বেষগ্নয়ঃ ॥
অগ্নির্দিব আ তপত্যগ্নের্দেবস্যোর্বন্তরিক্ষম্।
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্।
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞুস্ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু।[১]

—অগ্নি ভূমিতে ওষধিতে অবস্থান করেন,—জলসমূহ অগ্নিকে বহন করে—অগ্নি পুরুষ, গো এবং অশ্বের মধ্যে বাস করে,—অগ্নি দ্যুলোক থেকে তাপ দান করে,—এই বিশাল অন্তরীক্ষ অগ্নিদেবেরই। হব্যবাহ এবং ঘৃতপ্রিয় মর্তবাসীরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, অগ্নি যার বাস সেই অসিতজ্ঞু পৃথিবী আমাকে তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল করুক।

মহাভারতকার লিখেছেন :

সর্বমগ্নে ত্বমেবৈক ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ ॥[২]

—হে অগ্নি তুমি এক হ'য়েও সর্বব্যাপী। এই সমগ্র জগৎ তোমাতে বিধৃত। তুমি ভূতগণকে ধারণ কর—সকল ভুবনকে ভরণ কর।

এই অগ্নি মন্ত্রের উপাসনা রবীন্দ্র-কণ্ঠে শুনতে পাই :

প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।[৩]

১ অথর্ব—১২।১।১৯—২১।
২ মহাভারত—আদিপর্ব—২১৭।৩০
৩ পত্রপুট—পনেরো।

বৈদিক সংহিতায় দ্যাবা পৃথিবীকে অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্তকে 'ক্রন্দসী' এবং 'রোদসী' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে।

"যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে।"[১]

"যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং।"

"যং ক্রন্দসী অবতশ্চস্কভানে ভিয়সানে
রোদসী আহ্বয়েথাম্ ॥"[২]

রবীন্দ্র-কাব্যে উক্ত শব্দ দুটী নূতনতর ব্যঞ্জনা লাভ ক'রে অপূর্বত্ব সূচিত করেছে।

ঐ শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুর বধিরা উর্বশী।[৩]

কবি লিখেছেন ঐ শব্দদুটির ভাব প্রসঙ্গে, "অসীম একের যে আকুতি সেই বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত ক'রে রয়েছে। সে 'রোদসী' 'ক্রন্দসী—সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে আলোয় আলোয় আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে·আবর্তিত—সূর্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে সমস্ত মানুষের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে।"

শব্দ দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য সায়ন লিখেছেন "ক্রন্দিতবান্ রোদিতবাননয়োঃ প্রজাপতিরিতি দ্যাবা পৃথিব্যা। শ্রূয়তে হি 'যদরোদীত্তদনয়োঃ রোদস্তম্' (তৈঃ ব্রাঃ ২।২।৯।৪)।"[৪]

ঋষি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন মহৎ গুণাবলী :

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি ॥
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি ॥
মন্যুরসি মন্যু ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥[৫]

১ ঋগ্বেদ—২।১২।৮
২ ঋগ্বেদ—২।১২।১
৩ উর্বশী—চিত্রা।
৪ ঋক্ ভাষ্য—১০।১২১।৫।
৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১৯ অঃ ৯ কণ্ডিকা।

—তুমি তেজ স্বরূপ আমাতে তেজ নিহিত কর,—তুমি বীর্যরূপী আমাতে বীর্যাধান কর,—তুমি বল, আমাকে বল দাও,—তুমি ওজঃ (ওদার্য) আমাকে ওজঃ প্রদান কর, তুমি মন্যুময়, আমাকে মন্যু (অন্যায়—অসহিষ্ণুতা) দাও, তুমি সহিষ্ণুতা, আমাতে সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ন রাখ।

এই প্রার্থনা মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যে নব নব ভঙ্গীতে শোনা যায়। কবি প্রার্থনা করেছেন :

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র ॥
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি ॥
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য ॥
নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান ॥…[১]

———

আবার, তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে।

১ গীতিমাল্য—৫০

স্থখেরে কঠিন করি। বীর্ষ দেহো দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তিস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে।......[১]

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি—
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি।।·· ··২

ভারতবর্ষের জন্য কবির প্রার্থনা :—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয় রাজ ভয়, মৃত্যুভয় আর।......[৩]

এই কবিতাটিতে উপনিষদের "অভীঃ" মন্ত্র এবং অথর্ববেদের অভয়মন্ত্র ও অনুস্যূত আছে।[৪]

ঋষির আর একটি প্রার্থনা :

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগদপ।
প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক পন্থাং যাতবে সূর্য্যায়াগন্ম
যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ।।[৫]

—হে চিত্ত বৃত্তি সকল অথবা মনুষ্যগণ তোমরা আলস্য ত্যাগ করে ওঠ। আমাদের জীব (জীবাত্মা) প্রাণের মধ্যে এসেছিল, অর্থাৎ আমরা প্রাণের শক্তি অনুভব করেছি। অন্ধকার দূর হয়েছে, জ্যোতি আসছে। সূর্যের জন্য (জ্ঞানসূর্যের প্রকাশ জন্য) পথ উন্মুক্ত হয়েছে। অতএব চল গন্তব্যস্থানে যাই,—যেখানে আয়ু বর্ধিত হয়।[৬]

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা :

১ নৈবেদ্য—৯৯
২ পূজা—১১০
৩ নৈবেদ্য—৪৮
৪ এই গ্রন্থের ২৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য
৫ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৬
৬ দুর্গাদাস লাহিড়ীর ব্যাখ্যা অনুসরণে অনূদিত।

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তর ক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥
জাগো ভক্তির তীর্থে পূজা পুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখচিত্তে, জাগো অম্লানপ্রাণে,
জাগো নন্দননৃত্যে সুধা সিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দির দ্বারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে, পূর্ণের বাহুপাশে
জাগো নির্ভয়ধামে, জাগো সংগ্রাম সাজে
জাগো ব্রহ্মের নামে, জাগো কল্যাণ কাজে,
জাগো দুর্গমযাত্রী দুঃখের অভিসারে
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দির দ্বারে ॥[১]

জাগ জাগ আলস শয়ন বিলগ্ন।
জাগ জাগ তামসগহন নিমগ্ন ॥
ধৌত করুক করুণারুণবৃষ্টি সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগ জাগ দুঃখ ভারনত উদ্যমভগ্ন।
জ্যোতি সম্পদ ভরি দিক চিত্ত ধন প্রলোভন নাশন বিত্ত,
জাগ জাগ, পুণ্য বসন পর লজ্জিত নগ্ন ॥[২]

রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রার্থনা মন্ত্রদুটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে—উপনিষদের —"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত পাপ্য বরান্ নিবোধত"।[৩]

উপরোক্ত ঋক্‌মন্ত্রটির[৪] ছায়া নিম্নলিখিত কবিতাটিতে পড়েছে :

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির—বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।......[৫]

১ পূজা—২৭৫
২ বিচিত্র—৩১
৩ কঠোপনিষৎ—৩।৬৮।১১
৪ ২৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য
৫ গীতালি—১৭১

কবির কামনা :

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্যর্যমা
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥[১]

—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণপাদক্ষেপী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হউন।[২]

শং নো দ্যাবা পৃথিবী পূর্বহূতৌ
শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং নো ওষধীর্বনিনো ভবন্তু
শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণু ॥[৩]

—দ্যুলোক ও ভূলোক আনন্দময় হয়, দিক আনন্দে পরিমগ্ন হয়, তৃণগুল্ম বৃক্ষলতা আনন্দ বিতরণ করে, কেন না সেই আনন্দময় প্রভু আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া আছেন।[৪]

উপনিষদের আনন্দবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় তার প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি উপরোক্ত মন্ত্রদুটীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত কয়েকটি গান তুলনীয় :

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।…[৫]

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥………[৬]
নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে ॥……[৭]

১ ঋগ্বেদ—১।৯০।৯
২ অনুবাদ—৺রমেশ দত্ত
৩ অথর্ব—১৯।১০।৫
৪ অনু—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী
৫ পূজা—৩২৬
৬ ঐ—৩২৪
৭ পূজা—৩২৭

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা ॥......[১]

রবীন্দ্র-কাব্যের অপর একটি রূপকল্প বৈদিকমন্ত্রে পাওয়া যায়। কবি বর্ষশেষ কবিতায় লিখেছেন বর্ষশেষের ঝড়কে লক্ষ্য ক'রে :

শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে লয়ে যাও মোরে
পঙ্ককুণ্ড হতে।

শ্যেন পক্ষীর উপমা এবং নবজীবন লাভের জন্য দেবতার শ্যেনপক্ষীর গতিতে আবির্ভাবের কথা ঋগ্বেদে একাধিকবার আছে।

আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন
পপ্ততা সুমায়াঃ।[২]

—হে শোভনকারয়িতৃগণ (শোভনজ্ঞানদাতৃগণ), আপনারা আমাদের শ্রেষ্ঠ অভীষ্ঠ পূরণের সহিত আমাদের প্রতি ত্বরায় আগমন করুন। পক্ষিগণ (শ্যেনপক্ষিগণ) যেমন আকাশ থেকে ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করে, সেইরূপ ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করুন।

শ্যেনাঁ ইব ধ্রজতো অন্তরীক্ষে
কেন মহামনসা রীরমাম।[৩]

অন্তরীক্ষে গমনশীল শ্যেন পক্ষীর মত তোমার প্রীতিসাধক মননশীল স্তোত্রের দ্বারা আনন্দিত হই।

মা ত্বা শ্যেনঃ উদ্বধীন্মা সুপর্ণো
মা ত্বা বিদদিষু মান্বীরো অস্তা।[৪]

—হে শ্যেন, তুমি হিংসা ক'রো না। গড়ুর (সুপর্ণ) পক্ষী বিশেষকে হিংসা ক'রো না। বাণযুক্ত বীরকে প্রাপ্ত হ'য়ো না।

আ শ্যেনস্য জবসা নূতনেনাস্মে যাতং
না সত্যা সজোষাঃ।[৫]

১ পূজা—৩৮৫
২ ঋগ্বেদ—১।১৮৮।১
৩ ঋগ্বেদ—১।১৩৫।২
৪ ঋগ্বেদ—১।৪২।২
৫ ঐ —১।১১৮,১১

—সমান প্রীতিযুক্ত (সজোষা) সত্যপ্রাপক দেবদ্বয় (অশ্বিনীদ্বয়) শ্যেনের ন্যায় গতিবেগে আমাদের নূতন জীবন দান করতে আগমন করুন।

শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা।[১]

—শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগমনকারী সোম আনয়নকর্তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করি।

অথর্ববেদ বলছেন : আভ্যঃ শ্যেনোভূত্বা বিশ আ পতেমাঃ ।।[২]

শতপথ ব্রাহ্মণে গায়ত্রী শ্যেনরূপে স্বর্গ থেকে সোম আহরণ করেছেলেন।

"শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বেতি। তদ্ গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরৎ তেন সা শ্যেনঃ সোমভৃৎ…।"[৩] বৃহদ্দেবতায় পাই : ইন্দ্র শ্যেনরূপে অমৃত হরণ করেছিলেন।

"যস্য বৈ শ্যেনরূপেন অহর বৃত্রহা মধু।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা, শ্যেন পক্ষীর মত বর্ষশেষের ঝড় তাঁকে ক্ষুদ্রজীবন থেকে ভূমায় উত্তরিত করবে। এই রূপকল্পটি বহু প্রাচীন, এবং বৈদিক ঋষিদের প্রেরণাতেই সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈদিক রূপকল্পের ব্যবহার ভূরি ভূরি দেখা যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বৈদিক রূপকল্পের ব্যবহারের প্রমাণ আছে প্রচুর। বাহুল্যবোধে সেগুলির পুনরুল্লেখ করা হোল না।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এবং বৌদ্ধগাথার মত ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উপাখ্যান নবজন্ম পেয়েছে রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে।

বালক সত্যকাম বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হ'লে গুরু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত সত্যকাম মায়ের কাছ থেকে জেনে এসে আত্মপরিচয় দান করলেন :

"তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি, স হোবাচ নাহমেতদ্‌বেদ ভো, যদ্ গোত্রোঽহমস্মি, অপৃচ্ছং মাতরং, সা মা প্রত্যব্রবীৎ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতন্নবেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি, সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো

১ শুক্লযজুর্বেদ—৫।১।১

২ অথর্ব—৩।১।৩।৩

৩ শতপথ ব্রাঃ—৩।২

৪ বৃহদ্দেবতা ৪র্থ অঃ

ইতি। তং হোবাচ নৈতদ্—ব্রাহ্মণো বিবক্তুর্মর্হতি, সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি ॥[১]

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ কবিতায় লিখেছেন :

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম ;
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশীষ করি শুধাইল তবে,
"কি গোত্র তোমার, সৌম্য প্রিয়দরশন।"
তুলি শির কহিলা বালক," ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি,—"সত্যকাম
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে—
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
গোত্র তব নাহি জানি ।"
শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো, সবে বিস্ময় বিকল ;
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত।"

সত্যকামের উপাখ্যানটির রবীন্দ্রনাথ কৃত আর একটি রূপান্তর পাওয়া যায় :

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন
'ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার ?

১ ছান্দোগ্য ৪।৪।৪-৫।

তিনি বললেন, 'জানি নে তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহু পরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি
তাই জানি নে তোমার গোত্র,
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম'
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।[১]

রবীন্দ্রনাথ সংহিতা ও উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্রের পদ্যানুবাদ করেছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ) পঞ্চদশ খণ্ডে অনুবাদগুলি মূল সহ 'রূপান্তর' শিরোনামায় সংকলিত হয়েছে। যদি ও নিছক অনুবাদ কর্ম থেকে প্রভাব নিরূপণ করা যায় না, তথাপি বৈদিক মন্ত্রের প্রতি কবির তীব্র আকর্ষণ এবং সুগভীর অনুরাগের পরিচয় এগুলি থেকে পাওয়া যাবে। তাই এ আলোচনাকে সম্পূর্ণ করার জন্যই কয়েকটি উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে।

ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'হিরণ্যগর্ভ' সূক্তটি কাব্য হিসাবে উপাদেয়। ঋষি হিরণ্যগর্ভের স্তুতি প্রসংগে বলেছেন:

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়া মৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভুব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পাদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় বিধেম॥[২]

১ রূপান্তর—১৩

২ ঋগ্বেদ—১০।১২১।২-৬,৯

—যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ। মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন। কোন দেবতাকে[১] হব্যদ্বারা পুজা করিব? যিনি নিজ মহিমার দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয় সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা পুজা করিব? যাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরা যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিগ্বিদিক যাঁহার বাহুস্বরূপ। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পুজা করিব? এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষ লোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পুজা করিব? দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহা কর্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লসিত হইয়াছিল। এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাব্যাপৃথিবী যাঁহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া বুঝিতে পারিল। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পুজা করিব? যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাহার ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পুজা করিব?[২]

এই মন্ত্রগুলির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ:

আপনারে দেন যিনি
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পুজা করে
পুজে যাঁরে দেবতা সকল
অমৃত যাঁহার ছায়া
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

---

১ সায়নাচার্য 'ক' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজাপতি'।

২ অনুবাদ—রমেশ দত্ত।

যিনি মহা মহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমার্পণ !

এই সব হিমবান্
শৈলমালা মহিমা যাঁহার
মহিমা যাঁহার এই
নদী সাথে মহা পারাবার
দশ দিক যাঁর বাহু
নিখিলেরে করিছে ধারণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল
স্বর্গ লোকে সুরলোক
যার মাঝে রয়েছে অটল
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘ রাশি করেন সৃজন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে শুদ্ধ জ্যোতির্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়,

যাঁর মাঝে সূর্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !
সত্যধর্মা দ্যুলোকের
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন, না করুন পিতা !
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

এই অনুবাদটির একটি পাঠান্তরও উক্ত সংকলনে ধৃত হয়েছে।

আত্মদা বলদা যিনি, সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর, মৃত্যুও অমৃত যাঁর ছায়া,
আর কোন দেবতারে দিব মোরা হবি ?……

ঋষি বশিষ্ঠকৃত বরুণস্তবটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ঋষি প্রার্থনা করেছেন :

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো আদ্রিবঃ।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষ ॥[1]

—হে আয়ুধবান্ বরুণ ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় গমন করিতেছি। হে সুক্ষত্র ! দয়া কর, দয়া কর। হে ধনবান্, নির্মল

১ ঋগ্বেদ ৭।৮৯।২—৫।

বরুণ! আশক্তি প্রযুক্ত কর্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র। দয়া কর, দয়া কর। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। হে বরুণ! আমরা মনুষ্য। দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞান বশতঃ তোমার যে কর্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না।[১]

রবীন্দ্র নাথ লিখেছেন :

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
চঞ্চল অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপ পুরুষ, দীনহীন আমি
এসেছি পাপের কূলে—
প্রভু দয়া, কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া করে লও তুলে।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু
তৃষ্ণায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও
হৃদয় সুধায় ভরি॥

হে বরুণদেব,

মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ করে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞান ঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে।[২]

১ অনুবাদ—রমেশ দত্ত।

২ রূপান্তর ৬—৭।

গৃৎসমদ ঋষি বরুণের স্তুতি প্রসংগে বলেছেন :

আপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎ সম্রাল্ঋতা বোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যং হো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে॥
মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বং তমসুর ভ্রীণংতি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবস যানি গন্ম বি ধূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ॥
নমঃ পুরা তে বরুণেতি নূনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
তে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্য প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি॥
পর ঋনা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি॥[১]

—হে বরুণ! আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও, হে সম্রাট ও সত্যবান! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। বৎস হইতে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপ মোচন কর, কারণ তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহ এক নিমেষের জন্য ও আধিপত্য করিতে পারে না। হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে তাহাদিগকে যে আয়ুধ সকল হিংসা না করে। আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ সকল হিংসা না করে। আমরা যেন আলোক হইতে নির্বাসিত না হই, আমাদের জীবনের জন্য হিংসাকে বিশ্লিষ্ট কর। হে বহুস্থানোৎপন্ন বরুণ! আমরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে তোমার উদ্দেশ্যে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিব, যে হেতু হে অহিংসনীয় বরুণ! পর্বতের ন্যায় তোমাতে অচ্যুত কর্ম সকল আশ্রয় করিয়া থাকে। হে বরুণ! পূর্বপুরুষেরা যে ঋণ করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ কর, এবং সম্প্রতি আমি ও যে ঋণ করিতেছি তাহাও পরিশোধ কর। হে বরুণ! আমাকে যেন অন্যের উপার্জিত ধন ভোগ করিতে না হয়! অনেক উষা যেন উদিতই হয় নাই, হে বরুণ! আমরা যেন সেই সকল উষায় জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর।[২]

রবীন্দ্রনাথকৃত মন্ত্রগুলির অনুবাদ :

হে বরুণ, তুমি দূর করো হে, দূর করো মোর ভয়—
ওহে ঋতবান, ওহে সম্রাট, মোরে যেন দয়া হয়।

১ ঋগ্বেদ ২।৭।৬—৯।

২ অনুবাদ—রমেশ দত্ত।

বাঁধন ঘুচানো বৎসের মতো ঘুচাও পাপের দায়—
তুমি না রহিলে একটি নিমেষও কেহ কি রক্ষা পায়।
বিদ্রোহী যারা তাদের, হে দেব, যে দণ্ড কর দান—
আমার উপরে, হে বরুণ, তুমি হানিও না সেই বাণ।
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না, রাখো রাখো মোর প্রাণ।
তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত; আজও করি তব গান—
আগামী কালে ও সর্বপ্রকাশ, গাব আমি তব গান—
হে অপরাজিত, যত সনাতন বিধান তোমার কৃত
স্খলন বিহীন রয়েছে অটল পর্বতে আশ্রিত।
ওহে মহারাজ, দূর করে দাও নিজে করেছি যে পাপ!
অন্যের কৃত পাপফল যেন আমারে না দেয় তাপ।
বহু উষা আজও হয় নি উদিত, সে সব উষার মাঝে
আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে॥

অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন। ঋষি অভয় মন্ত্রে প্রার্থনা করেছেন :

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষ
মভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা-
দুত্ত রাদধরাদভয়ং নো অস্তু॥
অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রা
দয়ভং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিব নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥[১]

—অন্তরীক্ষ আমাদের অভয় দান করুক, দ্যাবাপৃথিবী অভয় দান করুক, পশ্চিম পূর্ব উত্তর ও দক্ষিণ দিক আমাদের অভয় দান করুক, মিত্র অভয় হোক জ্ঞাত শত্রু থেকে ভয় দূর হোক—সকল দিক অভয় হোক।

১ অথর্ব ১৯।১৫।৫—৬।

রবীন্দ্রনাথের অভয় মন্ত্রটি অনুবাদ :

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়,
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়,
ঊর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।
বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়,
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়।
রজনী অভয় হোক, দিবস অভয়,
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।[১]

এই প্রসংগে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের "ভয় হতে অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে।"[২] গানটী।

অথর্ব বেদের আর একটি মন্ত্র :

অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি ॥[৩]

রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ :

আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
'হৃদয়ের ব্যবধান হোক মুক্ত
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত।[৪]

পূর্বোল্লেখ ছাড়াও কতকগুলি উপনিষদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন। পূর্বোদ্ধৃত "যো দেবোঽগ্নৌ"[৫] ইত্যাদি মন্ত্রটির অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১ রূপান্তর—১১।

২ ব্রহ্ম সংগীত—২।

৩ অথর্ব ৬।৩১।১।

৪ রূপান্তর—১৬।

৫ এই গ্রন্থের ৬২ পৃঃ।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে
যিনি বৃক্ষে, যিনি শস্যে
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি বার বার।[১]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন,

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাঽস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥[২]

অন্যত্র বলেছেন :

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি,

রবীন্দ্রনাথ মন্ত্র দুটি একত্রিত করে অনুবাদ করেছেন।

জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ,
কলেবর নাই কভু—
তিনিই কারণ মনের চালন—
নাই পিতা নাই প্রভু।
ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
আছেন বিশ্বকাজে
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
ইঁহারই আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
ইঁহাকে জানেন যারা
জগতে অমর তাঁরা।[৩]

ঈশোপনিষৎ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলছেন :

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধম পাপবিদ্ধম্।

১ রূপান্তর—।
২ শ্বেতাশ্বতর ৬।৯
৩ রূপান্তর—৯।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ—
যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভঃ সমাভ্যঃ ॥[১]

—সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরশূন্য, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্যোতির্ময়, সর্বদর্শী, মনীষী, সর্বোপরি বর্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমাত্মা সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং সংবৎসরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ :

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার—
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানব মনের,
তিনি প্রভু নিখিল জনার—
আপনিই প্রভু আপনার।
বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অন্তকাল ধরি।
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলই উঠিছে ভরি ভরি।[২]

আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে বৈদিক ঋষির ধ্যান-ধারণা যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব সঞ্চার করেছে, বৈদিক রূপকল্পগুলিকে যেমন তিনি যত্র তত্র ব্যবহার করেছেন প্রচুর পরিমাণে, তেমনি বৈদিক মন্ত্রগুলির পদ্যানুবাদ করেও বাঙ্গালা সাহিত্যিকে পুষ্ট করেছেন।

১ ঈশ—৮।
২ রূপান্তর—১০

সপ্তদশ অধ্যায়

উত্তরকাব্যে ঔপনিষদিক চেতনা

জীবনের উত্তর প্রান্তে—এসে কবির আর্ষ চেতনা আরও গভীর হয়েছে। একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রাণ মন ভরে নিচ্ছেন, অপরদিকে তেমনি নিজের মধ্যে বিশ্বভূপের প্রকাশ অনুভব করেছেন,—আর স্ব সত্তাকে অনন্তের মধ্যে প্রসারিত বলে উপলব্ধি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দস্বরূপ অখণ্ডচৈতন্যে স্বীয় চৈতন্যকে লীন ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর ;
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ যাত্রীর
আলোক বেণুর।
সেদিন যিশ্বের তৃণ মোর বক্ষে হবে রোমাঞ্চিত
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত,
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা—
সেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।[১]

খুলে দাও দ্বার ঐ তার বেলা হ'ল শেষ
বুকে লও তারে
শান্তি অভিষেকে ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিঁদুর
প্রাদোষের তারা দিয়ে লিখে রেখো আলোক বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত সঙ্গীত ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে।[২]

---

১ মুক্তি—পূরবী। ২ সাবিত্রী—ঐ।

অসীমের অসংখ্য যা কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে ?[১]

যে অস্তিত্বের ধারা চারিদিকে প্রবহমান, সেই সর্বব্যাপী এক অনন্ত চৈতন্যের মাঝে ডুব দিয়ে কবি জীবনকে ভরিয়ে নিতে উৎসুক।

চারিদিক থেকে অস্তিত্বের এ ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা
চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যুসাগর সঙ্গমে।[২]

'শেষ সপ্তক' থেকেই কবির ঔপনিষদিক চেতনা গভীরতর হ'য়ে উঠেছে; কবির আত্ম সমীক্ষণ চলেছে আরও গভীরভাবে। তিনি শেষদিনের জন্য প্রতীক্ষারত।

১ মৃত্যু—পুনশ্চ।
২ শেষ সপ্তক—৪

প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য
তারই নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।[১]

কবির চিত্ত আসক্তিশূন্য। সুন্দরকে তিনি এখনও ভোগ করছেন,—ভোগ করছেন সর্ব-মোহমুক্ত মন নিয়ে।

এই নিত্য প্রবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্ম-বিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল,
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান
এই সত্যে নেই কোন সংশয়।[২]

জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি।[৩]

কবির মন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত,—কাজ ক'রে চলেছেন তিনি নিরাসক্ত হ'য়ে কাজ করাই তাঁর জীবনের ব্রত—কাজ করাই তাঁর জীবনের আনন্দ। নিরাসক্ত কর্ম গীতার শিক্ষা। ত্যাগের দ্বারা ভোগ—নিরন্তর নিস্পৃহ কর্ম আচরণই উপনিষদের উপদেশ।

১ সাত, শেষ সপ্তক।
২ আট—ঐ।
৩ ঐ—ঐ।

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জীজীবিষেৎ শতং সমাঃ ।[১]

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।"[২]

কর্মের বন্ধন কাটিয়ে উঠে ভারতীয় কর্মের আদর্শকে জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে কবি কাজ ক'রে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে,—জীবনে মূলমন্ত্র ক'রে নিয়েছেন, "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—আর দেখছেন মুক্তির রূপ।

কিছু কাজ করি—তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতিমুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর—
জীবনের চারিদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র;
সকল সুন্দরের কাছে তার আসন—তার মুক্তি।[৩]

বিশ্ব রহস্যে ডুব দিয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি এবং ক্ষুদ্র খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে বিরাটের স্পর্শলাভ 'শেষসপ্তকে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থে এই আত্মোপলব্ধি এবং সকলের সঙ্গে কবির একাত্মতার অনুভূতি আরও গভীর। যতই দিন এগিয়ে আসছে—ততই এই অনুভূতি গভীরতর—গভীরতম হ'য়ে উঠছে। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভব অতি প্রগাঢ়। অসীমের স্পর্শ সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—সর্বত্র তাঁর আবির্ভাবের আনন্দ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন।

'বীথিকার' 'অতীতের ছায়া' কবিতায় অতীত—ভবিষ্যৎ—বর্তমান এক হ'য়ে মিশে গেছে কবির চিত্তে।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্ত প্রায়
গোধূলি ধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্যতার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরু মাত্র নয়
এ যে চিত্তময়।

১ ঈশোপনিষৎ—২
২ গীতা—২।৪৭
৩ পনেরো—শেষস্তবক।

দ্বৈতভাবনা নিঃশেষে মুছে গেছে,—কবির চিত্তরাজ্যে আজ সব এক,—সব একাকার।

নাই সময়ের পদধ্বনি—
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ডপল কিছুই না গণি।
নাই আলো নাই অন্ধকার,—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই, তোমার আমার।
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হ'ল সব
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমিহীন চিত্তমাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।[১]

কবি সেই আনন্দ রাজ্যে মিশে গেছেন যে আনন্দ রাজ্য 'তমসঃ পরস্তাৎ' —যেখানে সূর্য্য তারকার আলো অথবা আলোর অভাব,—কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না।

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি।
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে
সকল লাভ, সব ক্ষতি
তুচ্ছ হ'লো অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।[২]

পরম আনন্দময়—পরম প্রাণের সঙ্গে একাত্মতার অনুভব যতই গভীর হয়েছে,—ততই কবি চিত্ত অপূর্ব পুলকে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছে।

বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীমকালে
যখন ভেবেছি
স্মৃতির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।

১ ধ্যান—বীথিকা।
২ নব পরিচয়—ঐ।

আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।[১]

এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হ'য়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীত ভবিষ্যতে।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় যে অনুভব কবিকে উতলা করেছিল—সৃষ্টির সেই প্রথম রহস্য থেকে সুরু ক'রে অনন্ত কালের অনন্ত রহস্য—সংক্ষেপে সমগ্র সৃষ্টি রহস্যই কবিচিত্তে বিবৃত;—এ অনুভূতি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবন—সায়াহ্নে।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য;—আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা সমাপ্ত হ'ল
দেবলোক থেকে মানব লোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।[২]

নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে কবির যে আধ্যাত্মিক অনুভব তাতে প্রাধান্য পেয়েছে, পরম পুরুষ বিশ্বদেবতার লীলা চিন্তন। 'পরিশেষ' থেকে যে আধ্যাত্মিক চিন্তা তাতে আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনই কবির চিন্তার বিষয়ীভূত হয়েছে। কবি মৃত্যুর আহ্বান সংকেত শোনার জন্য আরও উৎকর্ণ হ'য়ে রয়েছেন,—জীবন শেষের কাব্যগুলি তারই স্বাক্ষর বহন করেছে। মৃত্যুর পদধ্বনি কবির আত্মোপলব্ধিকে আরও নিবিড়, আরও গভীর,—আরও

১ পনেরো—পত্রপুট।
২ ঐ ঐ

একাগ্র ক'রে তুলেছে। সদ্যঃ রোগ মুক্ত কবির আত্মোপলব্ধি 'প্রান্তিক' কাব্যে সুগভীর।

সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকাইয়াছে তৃণতলে
সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট ধূলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গ-গুঞ্জনে। অনিঃশেষে যে তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে তারি রব
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব-দেহ-মন-প্রাণ
সূক্ষ্ম হ'য়ে প্রসারিল আজি ঐ নিঃশব্দ প্রান্তরে
ছায়া রৌদ্রে হেথা হোথা যেথায় রোমন্থনরত ধেনু
আলস্যে শিথিল অঙ্গ, তৃপ্তিরস সম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।[১]
বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হ'য়ে গিয়ে
আলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।[২]

'শ্যামলী' 'সেঁজুতি'কে ও আত্মোপলব্ধির কাব্য বলা যেতে পারে। কবি বুঝলেন আরও নিবিড় ভাবে যে সর্বত্রই তাঁর আত্মা প্রসারিত। তাই ত বিশ্বের সবই সুন্দর। তাঁর চেতনা সুন্দরকে সৃষ্টি করে বলেই ত চতুর্দিকে সুন্দরের মেলা। বিধাতার মতই সুন্দরের স্রষ্টা কবি আত্মা।

আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।[৩]

---

১ প্রান্তিক—৬।

২ প্রান্তিক—১।

৩ শ্যামলী—আমি।

বিশ্ব কবি স্রষ্টা,—আর স্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ এক সত্তায় এক চেতনায় দ্বৈত রহিত হ'য়ে উঠেছেন।

কবির আত্মোপলব্ধি গভীরতম হ'য়ে উঠেছে শেষ চারখানি কাব্যে—রোগ শয্যা, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখায়। অনাসক্ত দৃষ্টিতে কবি দেখলেন পৃথিবীতে জড়ে—জীবে প্রকৃতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুতে ও পরম জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব। বৈদিক ঋষির মতই তাঁর বাক্য হলো সংযত, সংক্ষিপ্ত,—অর্থের গভীরতায় পরিপূর্ণ। উপনিষদের মন্ত্রের মতই স্বল্প বাক্যে উদ্ভাসিত হ'লো গভীরতম সত্যের আলোক। সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষির মতই অদ্বয় বিশ্বাসে ও আত্মার সত্যস্বরূপ অধিগত হওয়ার আলোকে রবীন্দ্রনাথের শেষ চারখানি কাব্য সমুদ্‌ভাসিত। কোথাও কোথাও আছে রোগ যন্ত্রণার দুঃসহ বেদনা। কিন্তু রোগ যন্ত্রণার দুঃখকে অতিক্রম করে স্বচ্ছ সত্যদৃষ্টি বারে বারে ফিরে এসে কবিতাগুলিকে মন্ত্রের মতই সংহত এবং ভাস্বর ক'রে তুলেছে।

মানবের দুর্জয় চেতনা
দেহদুঃখ হেমানলে
যে অর্ঘের দিল সে আহুতি
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত জীবনের সম্পদ,
এমন নির্ভিক সহিষ্ণুতা
এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয় যাত্রা।[১]

রোগ দুঃখকে, মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করেই মানব-চেতনার জয়যাত্রা চলেছে। এই জয়যাত্রাই মানবের আপন সত্তাকে উপলব্ধি করার ফল। রোগ দুঃখকে অতিক্রম ক'রে দেশহীন কালহীন অন্তহীন জ্যোতির সন্ধান কবির কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে।

১ রোগশয্যা—৫।

রোগ দুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোক বিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি।
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার।
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো—
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্য সাগর তীর্থপথে।[১]

মানুষের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত মোহের আবরণ—সংস্কারের আবরণ,—অজ্ঞানের আবরণ। এই আবরণ তুলে ফেলতে না পারলে সত্যলাভ হবে কি ক'রে? প্রকৃতপক্ষে মনের আবরণ ঘোচানোই মানব-জীবনের সাধনা। ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়—সীমা থেকে অসীমে উত্তরণের উদ্দেশ্যেই ত মনের আবরণকে সত্যদৃষ্টির জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করা দরকার। কবিরও সুদীর্ঘ জীবনের সাধনা মনের আবরণটুকু উঠিয়ে ফেলার জন্য। এখনও কি কবির মন সকল মোহাবরণের উর্ধ্বে ওঠে নি? উঠেছে। এ জীবনের কাব্য চতুষ্টয়ে মোহমুক্ত মনের পরিচয়। তবু কবির আকাঙ্ক্ষা এখনও যদি থাকে কিছু মালিন্য—বিন্দুমাত্র মোহ, অণুতম সংস্কারের বন্ধন, তবে সেটুকু কাটিয়ে উঠতে হবে; তবেই ত সার্থক কবির জীবন-সাধনা—পরিপূর্ণ আত্ম সাক্ষাৎকার। এই উদ্দেশ্যে কবি বারংবার সবিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে সবিতা, মনের আবরণ দূর কর, সত্য প্রকাশ কর।

১ রোগশয্যায়—২০

অষ্টাদশ অধ্যায়

সবিতার উপাসনা

সবিতৃমন্ত্রের উপাসক কবি সারাজীবন উপাসনা করেছেন সবিতাদেবকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষার পর থেকে।—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ,—সূর্যই বরেণ্য দেবতা।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি।
তারে নমো নম।
তামিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও আজি কবি
ধ্বংস করি তম।
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরী—
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,—
নির্ঝর কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব-অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবন হিল্লোল।[১]

ঋগ্বেদের ঋষি সূর্যবন্দনা করেছিলেন সূর্যকে সকল দেবতার তথা বিশ্ব চরাচরের চক্ষু এবং প্রাণরূপে বর্ণনা ক'রে।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ
আপ্রা দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগত-স্তস্থুষশ্চ ॥[২]

—রশ্মিসমূহরূপ (দেবতাদের তেজসমষ্টিরূপে) মিত্র বরুণ এবং অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রকাশস্বরূপ) সূর্যমণ্ডল (প্রত্যহ) পূর্বদিকে উদিত হচ্ছেন;—অত্যাশ্চর্য এই ঘটনা। উদিত হ'য়েই (নিজের তেজের দ্বারা) স্বর্গ, মর্ত এবং অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেছেন।

১ সাবিত্রী—পূরবী।

২ ঋগ্বেদ—১।১১৫।১

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুস্বরূপ সূর্যদেবকে মোহনাশক, সত্যপ্রকাশক চক্ষু দান করতে প্রার্থনা জানিয়েছেন ঋষি :

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ।
সঞ্চেদং বি চ পশ্যেম।[১]

—হে সূর্য আমাদিগকে চক্ষু দাও, প্রকাশনের নিমিত্ত আমাদিগকে চক্ষু (প্রকাশক তেজ) দাও। প্রকাশনের নিমিত্ত (বিখ্যৈ) আমাদের শরীরে চক্ষু (তোমার প্রকাশ—সত্য প্রকাশক জ্যোতি) দান কর। তোমার তেজের দ্বারা আমরা এই সমগ্র জগৎ দর্শন করবো বিশেষভাবে (বিবিধভাবে অথবা যথার্থ স্বরূপে) সকল বস্তু দর্শন করবো।

সবিতা সর্বপ্রেরক দেব। তিনি সর্বব্যাপী—সর্বত্র বিরাজমান। তিনি ধন আয়ু সুখ দাতা। ঋষি বলছেন :

সবিতা পাশ্চাত্তাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ।[২]

—পশ্চিম দিকস্থ সবিতা, পূর্বদিকস্থিত সবিতা, দক্ষিণস্থিত সবিতা আমাদিগকে অভিলষিত ধনাদি প্রেরণ করুন। সবিতা আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সবিতার মাঝে সত্যের ছবি দেখে তাঁকে প্রণতি জানিয়েছেন, ঋষিও সত্যস্বরূপ সর্বপ্রকাশক আদিত্যকে প্রণাম জানিয়েছেন

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহোদেবায় তদৃতং সপর্যত।
দূরে দৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত।[৩]

—মিত্র ও বরুণের (সকল সৃষ্ট পদার্থের) চক্ষু (প্রকাশক) স্বরূপ মহান দেব দূরে অবস্থিত হ'য়েও দৃশ্যমান (প্রকাশের জন্য) জাত, বিশ্বের প্রকাশক (কেতবে) আকাশের পুত্র সূর্যকে নমস্কার ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে যাগাদিকর্ম সম্পন্ন কর (ঋতং সপর্যত) এবং তাঁর স্তুতি কর।

উপনিষদেও নানাস্থানে সূর্যকে জগতের প্রাণস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ ব'লে

১ ঋগ্বেদ—১০।১৫৮।৪
২ ঐ—১০।৩৬।১৪
৩ ঐ—১০।৩৭।১।

বর্ণনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে; "য এবাসৌ তপতি তমুদ্‌গীথমুপাসীত; উদ্যন্‌ বা এষ প্রজাভ্য উদ্‌গায়তি।"[১]

—এই যিনি তাপ দিতেছেন তাঁহাকে উদ্‌গীথ (প্রণব—ওঁকার) বলিয়া উপাসনা করিবে; ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্‌গীথ গানই করিয়া থাকেন।[২]

"সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চ উষোয়মুষ্ণোঽসৌ, স্বর ইতী সমাচক্ষতে, স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং এতমিমমুঞ্চোদ্‌গীথরূপাসীত।"[৩]

—এই প্রাণ নিশ্চয়ই সূর্যের তুল্য; এই প্রাণও উষ্ণ, সূর্যও উষ্ণ, প্রাণকে স্বর (মৃত্যু সময়ে বহির্গামী) বলে, সূর্যকেও স্বর (অস্তমিত), এবং প্রত্যাস্বর (প্রত্যাগমনশীল) বলিয়া থাকে। অতএব এই প্রাণ এবং ঐ সূর্যকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে।[৪]

"উদ্যন্‌ খলু বা আদিত্যঃ সর্বাণি ভূতানি
প্রণয়তি তস্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে।[৫]

—আদিত্য উদিত হ'য়ে সকল ভূতকে চৈতন্যযুক্ত করেন; এইজন্য তাঁহাকে প্রাণ বলা হ'য়ে থাকে।

"সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি।"[৬]—স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত ভূতই আদিত্যের স্তব ক'রে থাকেন।

"য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি স এবাহমস্মি।"[৭]—এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ দেখা যাচ্ছে, আমিই তিনি এবং তিনিই আমি।

"স য এতমেব বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাসো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আগচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়ন্‌।"[৮]—যে কোন লোক এই আদিত্যকে এইরূপে

১ ছান্দোগ্য—১।৩।১ (২৫)।

২ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৩ ছান্দোগ্য—১।৩।২ (২৬)।

৪ অনুবাদ ঐ ।

৫ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৫।৫।৬।

৬ ছান্দোগ্য—১।১১।৭ (১২)।

৭ ঐ ৪।১১।১ (৩২৯)।

৮ ঐ ৩।১৯।৪ (২৭৯)।

জানিয়া ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই অবিলম্বে শুভশব্দসমূহ ইহার নিকট উপস্থিত হয় এবং সুখভোগ সাধক হইয়া থাকে।[১]

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্র রশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ ॥[২]

—বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, অখিলপ্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয় তাপক্রিয়াকারী সূর্যকে (জ্ঞানিরা জানেন) অনন্তকিরণশালী, শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত হইতেছেন।[৩]

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥[৪]

যে সকল বিপ্র মন এবং অপর করণসমূহকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন তাঁহাদের দ্বারা সেই ব্যাপক মহান্ এবং সর্বজ্ঞ সবিতৃদেবের এই প্রকার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক; কারণ তিনি সর্বপ্রকার যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক, সর্বসাক্ষী এবং অদ্বিতীয়।

বৈদিক ঋষির সাধনার উত্তরাধিকার পুরাণ এবং তন্ত্রে। পুরাণ এবং তন্ত্রেও সূর্যকে জগতের আত্মা রূপে বারংবার বর্ণনা করা হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণে আছে :

প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যো জগচ্চক্ষুর্দিবাকরঃ।
তস্মাদ প্যধিকা কাচ্চিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী।

অন্যত্র আছে :

আরাধয়িষ্যে তপসা দেবমেকাক্ষরাহ্বয়ম্
প্রাণং বৃহন্তং পুরুষমাদিত্যারস্ত সংস্থিতম্ ॥[৫]

১ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
২ প্রশ্নোপনিষৎ—১।৮।
৩ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৪ শ্বেতাশ্বতর—২।৪।
৫ কূর্মপুরাণ—পূর্বাভাগ—২০।৪৬.

কূর্মপুরাণে সূর্যকে বলা হয়েছে : "মহাদেবং ভানুমাত্মানমব্যয়ম্।"[১] পুরাণেই সূর্যস্তবে পুরাণকার বল্‌ছেন :

ওঁ খখোল্কায় শান্তায় কারণত্রয়ায় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে।
নমস্তে ঘৃণিনে তুভ্যং সূর্যায় ব্রহ্মরূপিণে।
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্॥
ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বমোঙ্কারঃ সর্বো রুদ্রঃ সনাতনঃ।

* * *

হিরন্ময়ে গুহে গুপ্তমাত্মানং সর্বদেহিনাম্॥
নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্।[২]

রামায়ণে আছে, সূর্যদেব ত্রিলোকের সর্বকর্মসাক্ষী :

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃতকর্মসাক্ষিন্।[৩]

তন্ত্রে বলা হয়েছে : ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।[৪]
এখানে ও সূর্য সর্বসাক্ষী সনাতন আত্মা।

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বরনীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্বব্যাপি সনাতম্॥
যো ভর্গ সর্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ।
থর্মার্থ কাম মোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥[৫]

আবার অন্যত্র পাই :

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥

১ কূর্মপুরাণ—পূর্বাভাগ—৪১।১৭
২ ঐ উপরিভাগ—১৮।৩৬—৩৮, ৪৪—৪৫।
৩ রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড—৬৩।১৬
৪ শারদা তিলক—১৪।৬১।
৫ মহানির্বাণতন্ত্র—৯।২১৮।২২০।

তথা হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্যঃ স চান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চিত্রক্করং যতঃ ॥
হৃদাকাশে চ যো জীব : সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্ণভসি রাজতে ॥[১]

বহিরাকাশে যিনি সূর্যরূপে প্রতিভাত, অন্তরাকাশে তিনিই জীবরূপে বিরাজিত—তিনিই সর্বভূতে অন্তরাত্মা। সূর্যের 'সবিতা নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে তন্ত্র বলছেন :

সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সচনাৎ পাবনাচ্চৈ সবিতা তেন চোচ্যতে।[২]

সকল ভূতের অন্তরাত্মা রূপে সর্বজীবের ভাবসমূহ তিনি সৃষ্টি করেন। প্রসব করার জন্য (যজ্ঞে হবিঃ লাভের জন্য) এবং সকলকে পবিত্র করেন বলেই তিনি সবিতা।

ব্রাহ্মণে ও ঐ একই তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে :
"আদিত্যো বৈ দৈবং ক্ষত্রমাদিত্য এষাং ভূতানামধি-
পতি :···শ্রেষ্ঠং জ্যোতিরুত্তমং দেব সবিতর্দৈব
যজনং মে দেহি·········।[৩]

—আদিত্য দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতি—ইনি সকল প্রাণীর অধিপতি ······শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ (জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম); হে দেব সবিতা দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগ সম্পাদন করার সামর্থ্য দাও।

সৌর পুরাণে মনু সূর্যস্তব প্রসংগে বলছেন :

নমো নমো ররেণ্যায় বরদায়াংশুমালিনে।
জ্যোতির্ময় নমস্তুভ্যমনন্তায়াজিতায় তে ॥
ত্রিলোকচক্ষুষে তুভ্যং ত্রিগুণায়ামৃতায় চ।
নমো ধর্মায় হংসায় জগজ্জনন হেতবে ॥
নরনারী শরীরায় নমো মীঢ়ষ্টমায়[৪] তে।
প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্বায় ত্রিমূর্তয়ে ॥[৫]

---

১ যোগিযাগ্যবল্ক।
২ ঐ
৩ ঐ তরেয় ব্রাহ্মণ—৭।২
৪ শ্রেষ্ঠবর্ষণকারী।
৫ সৌরপুরাণ—১।৩০—২

আচার্য বরাহমিহির ও সূর্যবন্দনায় সূর্যকে বিশ্বাত্মা রূপেই বন্দনা করেছেন :

জয়তি জগতঃ প্রসূতির্বিশ্বাত্মা সহজভূষনং নভসঃ।
দ্রুতকনক সদৃশ দশশত ময়ূখমালার্চিতঃ সবিতা ॥[১]

—জগতের প্রসবিতা, বিশ্বের আত্মস্বরূপ, গলিত স্বর্ণতুল্য, সহস্র কিরণ শোভিত সবিতার জয় হোক।

ভারতীয় ঋষির সাধনালব্ধ জ্ঞান রবীন্দ্র চিত্তকে ভাস্বর করেছে। তাই সূর্যোপাসক রবীন্দ্রনাথ সূর্যকে সর্বভূতের আত্মা তথা নিজেরও অন্তরাত্মার প্রকাশক তেজরূপে—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণাত্মিকা শক্তিরূপে সকল প্রাণের উৎস রূপে উপলব্ধি করেছেন।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, স্বরের তরণী ;
আয়ু স্রোত মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে—কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পুরিত
করে মুগ্ধ চোখ।[২]

কবি সবিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁকে রশ্মি-জালের মাঝে টেনে নিয়ে পরম প্রাণে লীন করে সার্থক ক'রে তুলতে।

দাও খুলে দাও দ্বার ওই তার বেলা হল শেষ
বুকে লও তারে।
শান্তি অভিষেক হোক ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি উৎসধারে ।[৩]

এই ভাবনা কবির অনেক দিনের,—যখন থেকে বেদ-উপনিষদের জ্ঞানের

১ বৃহৎ সংহিতা—১।১।
২ সাবিত্রী—পূরবী।
৩ ঐ ঐ ।

আলো কবিচিত্তকে সমুদ্ভাসিত করেছে তখনকার। প্রভাত সংগীতেই কবি সূর্যদেবকে অনুরূপ প্রার্থনা জানিয়েছেন :

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও
অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে।[১]

আর্ষ দৃষ্টির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

"অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আ প্রণ যৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ।"[২]

ঋষি বলেন, আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় কেশ—হিরণ্ময় শ্মশ্রুযুক্ত প্রাণস্বরূপ হিরণ্ময় পুরুষই আত্মা—ব্রহ্ম। "য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স এবাহমস্মি।"

কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষের সত্যস্বরূপ সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকে আবৃত,—সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচর। ঋষি তাই আলোক-আবরণের পরপারে অমৃত—আত্মাকে জানতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও কামনা করেছেন, তাঁর মন থেকে সকল মোহ দূর হোক,—দূর হোক তমঃ-আবরণ,—জ্যোতি স্বরূপ সূর্যমণ্ডলে কবি প্রত্যক্ষ করুন সত্য,—অমৃত,—অদ্বৈতকে; উপলব্ধি করুন আত্মার যথার্থ স্বরূপ। শেষ জীবনের কাব্য কয়খানিতে এই কামনা বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। সূর্যের সংগে কখনও তিনি নিজেকে অভিন্ন ব'লে বোধ করেছেন।

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাত-সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;

১ প্রভাত উৎসব।

২ ছান্দোগ্য—১।৬।৬ (৫২)।

ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,……১

প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
অমোর চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।২

তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্‌ভাসিয়া উঠে
প্রভাত আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।৩

উপনিষদের কবি প্রার্থনা করেছিলেন:

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥৪

—হে পুষণ্ (জগৎ-পোষক সূর্য্য)! জ্যোতির্ময় পাত্র (সূর্যমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্মপরায়ণ (সত্যধর্মলাভের জন্য) আমি উহা দর্শন করি।৫

পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।

১ কালরাত্রি—শ্যামলী।

২ পত্রপুট—১৫।

৩ রোগশয্যায়—৩৬।

৪ ঈশ—১৫।

৫ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ.

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।[১]

—হে জগৎ-পোষক! এক-চর! সংযমকারিন্ প্রজাপতি-সম্ভূত! সূর্য! রশ্মিসমূহ দূর কর; এবং তীব্র তেজ সংকোচিত কর। তোমার যাহা অতি মঙ্গলময় রূপ, তাহা দর্শন করি। এই যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, আমিও তৎস্বরূপ হইয়াছি।[২]

সূর্য আত্মা—সূর্যই ব্রহ্ম—তিনি জগৎ-পোষাক পূষণ্, জগৎ স্থিতিকর্তা বিষ্ণু নারায়ণ। "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ।"

শঙ্খচক্র গদাপদ্মধরং কমললোচনম্।
শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশং কচিন্নীলাম্বুদ চ্ছবিম্॥

* *

কেয়ুর কুণ্ডলধরং কিরীট মুকুটোজ্জলম্।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্॥
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্যমণ্ডলমধ্যগম্।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে॥[৩]

বিষ্ণুরূপী সূর্যই তিন পদবিক্ষেপে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং) পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ পরিভ্রমণ ক'রে থাকেন।

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদা।"[৪]

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণে—
ষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥[৫]

—সেই মহানুভব বিষ্ণু স্বীয় বীরকর্মের জন্য সকলের দ্বারা স্তুত হন। সিংহ যেমন ভয়ংকর হিংসাকারী (দুর্গম-প্রদেশ-গামী) পর্বতাদি উন্নত প্রদেশে

১ ঈশ—১৬
২ অনু—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
৩ কালিকা পুরাণ—২২।৩২, ৩৪—৩৫।
৪ ঋগ্বেদ—১।২২।১৩।
৫ ঐ ১।১১৪।৩।

বিচরণ-কারী,—তেমনি ইনিও শত্রুদের নিকট ভয়ানক, সর্বত্র বিচরণশীল এবং পর্বততুল্য উচ্চ দ্যুলোক-বাসী (মন্ত্রমধ্যে অবস্থিত)। যে বিষ্ণুর পাদ-প্রক্ষেপে সমস্ত বিশ্ব-ভুবন আশ্রিত হ'য়ে বাস করে।

সূর্যরূপী বিষ্ণুই ত্রিলোকের স্রষ্টা।

য ইদং দীর্ঘং প্রতিং সধস্থ-
মেকো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ ॥

—যে বিষ্ণু এই দৃশ্যমান অতি-বিস্তৃত ত্রিলোক এক এবং অদ্বিতীয় হ'য়েও তিন পাদের দ্বারা নির্মাণ করেন।

বিষ্ণুর তৃতীয় পদ মধ্যাকাশে ভাস্বর হয়ে থাকে :

"এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্।"[১]

ব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃমণ্ডলে অবস্থিত বিষ্ণুর পরম পদ ধ্যানীর ধ্যানের ধন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিদীব চক্ষুরাততম্।[২]

—সকলের চক্ষুস্বরূপ আকাশমণ্ডলে প্রকাশিত বিষ্ণুর সেই পরম পদ জ্ঞানিগণ সর্বদা দর্শন করেন।

দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥[৩]

রবীন্দ্রনাথও ধ্যান করেছেন সূর্যের পরম পদ। পরম-পদ ধ্যান করতে করতে কবির কাছে প্রকাশিত হয় আত্মার স্বরূপ। ঋষি কবির পূর্বোল্লিখিত প্রার্থনা মন্ত্র স্মরণ ক'রে কবি আন্তর কামনা ব্যক্ত করেন সবিতার কাছে ঋষি কবির মতই :

তখন মনে পড়ে সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি কবির প্রার্থনামন্ত্র—
যে মন্ত্রে বলেছিলেন,—হে পূষণ,
তোমার হিরন্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

১ বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৯৩।
২ ঋগ্বেদ—১।২২।২০।
৩ বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৯৮।

আমিও প্রতিদিন উদয় দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ
বলি হে সবিতা
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
সেই সত্য তোমারি।
তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্য সাগরেরর কূলে
কখনো হিমাদ্রি গিরিতটে—
বলেছে, জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
বলেছে, দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের আবির্ভাব।[১]
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোন অজানিত, সন্থ গেছে নামি
সত্তা হ'তে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে।[২]

১ পত্রপুট—দশ।
২ প্রান্তিক—১২।

ঋষি কবির ঘোষণা—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।—

রবীন্দ্র জীবনে তথা কাব্যে বিশেষতঃ অন্ত-পর্বের কাব্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যে মন্ত্র আগে ছিল শ্রবণের মননের, এখন কবির জীবন-সায়াহ্নে পরিণত হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়ে, কবির জীবন-বেদরূপে, সত্যদ্রষ্টা ঋষির চিরপুরাতন অথচ চির নূতন আত্মজ্ঞানের নবতর উপলব্ধি ঘটেছে। কখনও তাঁর মনে হয়েছে, ঋষিকবির ধ্যান-দৃষ্টির অধিকারী হ'লেও ঋষি-কবির প্রকাশ-শক্তির বুঝি তিনি অধিকারী হ'তে পারেন নি।

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি' নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা;
সেই সবিতার যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্তের প্রাঙ্গন তলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।
মনে মনে ভাবিয়াছি প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।'[১]

কখনও দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে ধ্বনিত হয় কবি-কণ্ঠে ঋষির পুরাতন প্রার্থনা ঃ

হে প্রভাত সূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল।
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরন্ময় ঐশ্বর্যে তোমার।
দূর করি দাও
পরাভূত রজনীর অপমান সহ।[২]

১ আরোগ্য—৩।
২ রোগশয্যায়—১৫।

ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত লোকের দ্বারে
নিদ্রায় জড়িত রাত্রি সম।
হে সবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।[১]

অথর্ব বেদের ঋষি উপনিষদের ঋষির মতই প্রার্থনা করেছেন সবিতার কাছে পাপ দূর ক'রে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করার জন্য।

যত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরং অস্তি যদ্বা
কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা।
সর্বে তদ্বা চাপ হন্মো বয়ং দেবস্ত্বা
সবিতা সূদয়তু।[২]

—হে জীব! দ্যোতমান জ্ঞান প্রেরক সবিতাদেব তোমাকে শ্রেয়োদান করুন; তাহাতে তোমার হৃদয়ে ও দেহে অনুভূয়মান বা পরিদৃশ্যমান যে পাপ (অজ্ঞতারূপ যে ঘোর) বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা তোমার শিরোভাগে মস্তিষ্কে এবং দৃষ্টিসাধন ভূত নেত্রে যে পাপ বিদ্যমান আছে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সেই সকল পাপকে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনাকারী অপহত করি (দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব)। [জ্ঞান প্রেরক সবিতা দেবতা কৃপাপরায়ণ হইলে মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে আমরা আমাদিগের সর্বপ্রকার পাপনাশে সমর্থ হইব,—ইহাই ভাবার্থ][৩]

অনু সূর্য্যমুদয়তাং হৃদ্দ্যোতো হরি মা চ তে।
গো রহিতস্য বর্ণেন তেন ত্বা পরিদধ্মসি ॥[৪]

---

১ জন্মদিনে—২৩।

২ অথর্ব—১।২।৩।

৩ অনুবাদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।

৪ অথর্ব— ১।৪।১।

—হে জীব, তোমার হৃদয়-সম্বন্ধী রোগ (বন্ধন হেতুভূত অন্তর্ব্যাধি) এবং কালিমাদি শরীর ব্যাধি (বন্ধন মূল বহির্ব্যাধি অর্থাৎ সৎপথাবরোধক কর্মপ্রভাবাদি) সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর। লোহিতবর্ণ জ্ঞান-কিরণের সেই প্রসিদ্ধ (ব্যাধিনাশ-সমর্থ অথবা বন্ধন-মোচন সমর্থ) দীপ্তির দ্বারা (তুমি) তোমাকে আচ্ছাদিত কর (দীপ্তিমন্ত কর)।[১]

রবীন্দ্রনাথও আত্মার মহিমা আচ্ছাদক পাপ বিনাশের জন্য প্রার্থনা করেছেন সবিতাকে।

আত্মার মহিমা যাহা
তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান-অবসাদে, তারে দাও দূর করি।
লুপ্ত হ'য়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার জালে।[২]

সবিতার কৃপায় কবির সত্তার আবরণ ক্ষয় হয়ে গেল।—

আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত।[৩]

কবির দেহ-চেতনা নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে অনন্ত চেতনার মাঝে। কবি আত্মা বিশ্ব ছেড়ে নক্ষত্রলোকে পাড়ি দিয়েছে। কবি আদিত্য-মণ্ডলের মহান্ পুরুষের দর্শনার্থী।

১ অনু—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২ জন্মদিনে—২৪।
৩ রোগশয্যায়— ২২।

ছায়া হ'য়ে বিন্দু হ'য়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্র বেদীর তলে আমি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে
হে পুষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তব কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আত্মার মাঝে এক।[১]

তমসের পরপারে সূর্যদেবের অন্তরস্থিত মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শনে কবি জীবনের সার্থক অর্থ খুঁজে পেলেন। জীবনের আদি-অন্তের অর্থ সমুদ্ভাসিত হলো কবির আবরণ মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে।

তিনি ঘোষণা করলেন,

সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাকালে সে আপন না ফেলুক ছায়া
মর্তের ধরিয়া ছদ্মবেশ।
এ মর্তের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সেই সুন্দরের রূপে
সে সঙ্গীতে অনির্বচনীয়।[২]

১ প্রান্তিক—৯। ২ জন্মদিনে—১৩

উপনিষদের ঋষির মতই রবীন্দ্রনাথ সত্যদর্শন করলেন :

আয়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর।[১]

—অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক, হে চিন্তাশীল মন, তুমি কৃত এবং কর্তব্য স্মরণ কর।[২]

কবির মোহ আবরণ ঘুচে গেছে। জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্যমণ্ডলের জ্যোতি সর্বত্র দেখছেন ; উপলব্ধি করছেন এক প্রাণের বিরাট প্রবাহ, যার মধ্যে সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-মনুষ্য-বৃক্ষ-তৃণ-কবি-আত্মা এক অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে।

"প্রাণের যোগ নয় ত কি ? সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে বইচে। আমাদের প্রাণ, মন, আমাদের রূপ, রস সবই তো উৎসরূপে রয়েচে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল ওরি বহ্নি বাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই ত প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত ! সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ্, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক মদ হ'য়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই ত আমার গানে গানে সুর হ'য়ে পুঞ্জিত হ'ল ! এখনই আমার চিত্ত হ'তে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চিন্ময় স্বরূপ নয়, যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় স্তব্ধ ওঁকার ধ্বনির মত সংহত হ'য়ে আছে ?

হে সূর্য তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হ'য়ে গাছ হ'য়ে আকাশে উঠচে, বল্‌চে, জয় হোক ! বলচে, ঢাকা খুলে দাও ! এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুল-ফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝর-ধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে

১ ঈশ—১৭

২ অনুবাদ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

পাড়ি দিয়ে চললো। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলচি, হে-পুষণ্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য, তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।"[১]

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতস-বাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগ যুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমি ও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা লয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।[২]

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক্
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ
সর্বমানুষের মাঝে
এক চির মানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।[৩]

এ যুগের প্রত্যেকটি কবিতা আর্য চিন্তার প্রভাবে গভীর—অনুভূতির আবেগে ভাব-তন্ময়। এমনি তন্ময় হয়েই ঋষি বলেছিলেন গভীর আবেগে সূর্যরূপী বিষ্ণুকে :

সা বিশ্বায়ু সা বিশ্বকর্মা সা বিশ্বধায়াঃ
ইন্দ্রস্য ত্বা ভাগং সোমেনাতনচ্মি বিষ্ণো হব্যং রক্ষ।[৪]

১ পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী ২৬ শে অক্টোবর ৫
২ আরোগ্য—৯।
৩ ঐ—৩৩।
৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১।৪।৪।

—সেই (বিষ্ণু) দেবতা নিখিল বিশ্বের জীবন—স্বরূপ, সেই দেবতা বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সকল কর্মের মূলীভূত, সেই দেবতা সকলের ধারণ কর্তা (এবং পোষণ কর্তা)। ইন্দ্রের ভোগ্য সোমের দ্বারা (শুদ্ধভাবের দ্বারা) তোমাকে (হৃদয়ে) দৃঢ়ভাবে স্থাপন করছি, হে বিষ্ণো, তুমি হব্য (হৃদয়-স্থিত সত্ত্বভাব) রক্ষা কর।

জন্ম-মৃত্যু-জীবন বিশ্ব প্রবাহের অঙ্গীভূত—অদ্বয় অভিন্ন,—একই জ্যোতির লীলা। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমার সাথে সকলেই অচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত। জন্ম-মৃত্যুর পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা নিরর্থক। এই সত্য অনুভব ক'রে শান্তভাবে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন কবি।

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এই মর্ম নিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্র পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ—
সে রহস্য সূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশিবর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।[১]

———

বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হ'য়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অনন্ত দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।[২]

১ জন্মদিনে—৫।
২ ঐ—১২।

কবির আকাঙ্ক্ষা, তিনি পরিপূর্ণ চৈতন্যের আলোহীন অন্ধকারহীন অখণ্ডতার মাঝে লীন হ'য়ে যাবেন, যার সম্পর্কে শ্রুতি বলেছেন,

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥

কবির জীবন পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে কানায় কানায়—চৈতন্য সাগরে মিশে পূর্ণতা লাভের ইঙ্গিত এসে পৌঁছাচ্ছে তাঁর কাছে :

পথ রেখা লীন হলো অস্তগিরির শিখর আড়ালে
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা দ্বারে
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী।
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রা পথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে, নহে দূর, নহে বহুদূর।[১]

———

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
এক আদি-জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আমির সাথে যুক্ত হ'তে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।[২]

১ আরোগ্য—৮।
২ ঐ—৩২।

ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

যে চেতনা উদ্ভাসিয়া ওঠে
প্রভাত আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ
শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়।

তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।[১]

আনন্দ-সাগরে ডুব দিয়ে কবি-কণ্ঠ বাণীহারা স্তব্ধ।

কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকুতি।
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ
করে থাকে চুপ,
বলে আমি আনন্দিত, ছন্দ যায় থামি
বলে, ধন্য আমি।[২]

আনন্দময়ের লীলা-নিকেতন এই আনন্দভূমি আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। তাই কবি শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বের আনন্দকে প্রাণ-মন ভরে পান ক'রে নিতে চেয়েছেন—আর অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বকে ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন।

এ জন্মের গোধূলি ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই—
মোর ভালোবাসা'।[৩]

১ রোগশয্যায়—৩৬।
২ আরোগ্য—৫।
৩ পরিশেষ—জন্মদিন।

ইহ লীলা সাঙ্গ করার পূর্বে কবি শেষবার সূর্যের কিরণে দেহমন অভিষিক্ত করে নিতে চেয়েছেন।

খুলে দাও দ্বার
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নব শষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে ;
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে।[১]

১ রোগশয্যায়—২৭

উনবিংশ অধ্যায়

মধুমন্ত্র

জ্যোতির্ময় প্রাণময় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ এই বিশ্বজগৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতই রবীন্দ্রনাথের কাছে মধুময় হ'য়ে উঠেছে। ব্রহ্মই মধু,—ব্রহ্মই অমৃত,—ব্রহ্মই পরম সুন্দর; তাঁরই বিচিত্র প্রকাশ তাঁর সৃষ্টিও মধু, অমৃত, সুন্দর—আনন্দ-নিকেতন। ঋষির কামনা মধুময় ব্রহ্মকে জানা—বিশ্বকে মধুময় ব'লে অনুভব করা—নিজের জীবনকে পরম সত্যের অনুভবে মধুময় ক'রে তোলা।

ঋষি প্রার্থনা করেছেন উপাস্য দেবতার কাছে :

মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়ণম্।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতম্।।[১]

—হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গৃহ থেকে পরাগমন (দূরগমন) মধুযুক্ত হোক, আমার গৃহে প্রত্যাগমন [জন্ম ও মৃত্যু?] মধুযুক্ত হোক্। হে দেবদ্বয়, তোমরা আমাকে দেবতাদের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত কর।

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসন্দৃশঃ।।
মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্ মধুমত্তরঃ।
মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীব।।[২]

—আমার নিকটগমন (ইহজীবন) মধুযুক্ত হোক্, আমার পরাগমন (দূরগমন—পরলোক), মধুময় হোক্, বাক্যের দ্বারা যা বলি তা মধুময় হোক্। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে মধুময় হওয়ায় মধুময় কার্যযুক্ত আমি সকল দর্শকের কাছে মধুময় (প্রীতিকর) হই।।

আমি মধু হই। মধুতর (অধিকতর মধুর রসযুক্ত অমৃত সংযুক্ত) হই। মধুস্রাবী হওয়ায় আমি অতিশয় মধুযুক্ত হই। লোকে যেমন বৃক্ষের

১ ঋগ্বেদ—১০।২৪।৬।

২ অথর্ব—১।৩৪।৩—৪।

মধুযুক্তা শাখার সেবা করে সেইরূপ (হে অমৃতময় ভগবান) তুমি আমার সন্নিহিত হও ॥

জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধুকলম্
মমদেহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥[১]

—আমার রসনায় অমৃত বর্তমান হউক। বাগ্‌যন্ত্রে অমৃত বিদ্যমান থাকুক; হে অমৃত-সম্বন্ধ শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমার সর্ববিধ কর্মে নিশ্চিতরূপে বর্তমান থাক, অপিচ, তুমি আমার অন্তরকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও। (আমার সর্ববিধ কর্ম সদাকাল অমৃত সম্বন্ধি এবং ইষ্টপ্রাপক হউক)[২]

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্ব-
রিষ্যন্ত অন্বেনং চরেম ॥[৩]

—ওষধিসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক। ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। (সর্ববিধ কর্ম সদাকাল অমৃত সম্বন্ধি এবং ইষ্টপ্রাপক হউক)।[৪]

উপনিষদ্ মধুবিদ্যার প্রবক্তা এবং ব্যাখ্যাতা। উপনিষদ্ বলছেন, "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।"[৫]

—এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু, সমস্ত ভূত ও এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময় প্রকাশময় ও চিন্মাত্র নিত্যপুরুষ এবং যিনি অধ্যাত্ম-শরীর সম্বন্ধযুক্ত চিন্মাত্র প্রকাশময় পুরুষ—সেই পুরুষই সকল ভূতের মধু—তিনিই আত্মা—তিনিই সর্বময় ব্রহ্ম।

"ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ.........স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং

---

১ অথর্ব—১।৬।২৭।
২ অনুবাদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৩ ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৩।
৪ অনুবাদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৫ বৃহদারণ্যক—২।৪।১

ব্রহ্মেদং সর্বম্। অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু·········
অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু·········।"[১]

এইভাবে মধু মন্ত্রের দ্রষ্টা—মধু মন্ত্রের উপাসক ঋষি মধুময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন জলে স্থলে চরাচরে সর্বভূতে। সংহতভাবে শ্রুতি এই কথাই বলেছেন অন্যত্র :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধু মান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥[২]

—মধুময় বায়ু প্রবাহিত হোক্, সিন্ধুগণ (নদীগণ) মধু ক্ষরণ করুক, ওষধি মধুসংযুক্ত হোক, রাত্রি এবং ঊষা মধুময় হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক। হে পিতঃ, আকাশ মধুময় হোক, বনস্পতি মধুময় হোক, সূর্য মধু সংযুক্ত হোক, আমাদের গাভী মধুসংযুক্ত হোক।

ঋষি আরও প্রার্থনা করেছেন, "ব্রহ্মমেতু মাম্। মধুমেতু মাম্। ব্রহ্মমেব মধুমেতি মাম্।"[৩]—ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হোন, মধু আমাকে আশ্রয় করুক, মধুময় ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হোন।

সূর্যরূপী বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপও মধুযুক্ত।

যস্য ত্রি পূর্ণা মধুনা পদা
ন্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি ॥[৪]

—যে বিষ্ণুর মধুপূর্ণ তিনপদ অক্ষয় আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয়।

প্রভাত সঙ্গীতের তরুণ কবি জগতের সব কিছুকেই মধুময় ব'লে জেনেছিলেন।

১ বৃহদারণ্যক—২।৪।১।

২ ঐ

৩ ঋগ্বেদ—১৪।৯০।৬—৮।

৪ নারায়ণোপনিষৎ—অনুবাক্—৩৮।

পুরব মেঘ মুখে পড়েছে রবিরেখা
অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলবর,
মধুর আহা কিবা, মধুর মধুসব।[১]

ঋষির দৃষ্টি লাভ ক'রে ঋষির মতই রবীন্দ্রনাথ বললেন,

বেদ মন্ত্রের ছন্দে
মন বললে—
মধুময় পার্থিব ধূলি।[২]
সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে
মধুময় ক'রে দেয় ধরণীর ধূলি
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির-মানবের সিংহাসন।[৩]

রবীন্দ্রনাথের আর্ষদৃষ্টিতে আকাশ বাতাস মধুময় হ'য়ে ওঠে। প্রাচীন ঋষির তপোলব্ধ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লাভ করেছেন নতুন ক'রে।

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।

---

১ প্রভাত উৎসব—প্রভাত সঙ্গীত।

২ পত্রপুট—পাঁচ।

৩ আরোগ্য—২।

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।[১]

মধুবাহী ডাকহরকরার উদ্দেশ্যে কবি লিখেছেন :

দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে,
তোমারে ধরিল ধরা মধুময় আশীর্ব্বাদ-দানে।[২]

যে বিশ্বজগৎ বিচিত্র সৌন্দর্যে ভরা—যেখানে অপার অসীম বৈচিত্র্য—অনন্ত রহস্য—ছোট বড় স্থাবর জঙ্গম নিয়ে অপরূপ—যার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে ঋষি অনুভব করেছেন মধু-ব্রহ্মের প্রকাশ—সেই বিশ্ব চরাচরকে বেদের ঋষি প্রণতি জানিয়েছেন :

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ
যজাম দেবান্ যদি শক্নুবাম
মা জ্যায়স শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ ।।[৩]

—মহৎকে নমস্কার, অর্ভককে (শিশু) নমস্কার, যুবকগণকে নমস্কার, বৃদ্ধগণকে নমস্কার। যদি সাধ্য হয়, দেবগণের অর্চনা করবো; হে দেবগণ বৃদ্ধদের স্তুতি যেন ত্যাগ না করি।

অথর্ব বেদে আছে :

নমো রুদ্রায় নমো অস্তু তক্মনে নমো রাজ্ঞে বরুণায় দিধীমতে।
নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধীভ্যঃ।[৪]

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ।
নমঃ পূর্বজায় চ চাপরজায় চ ।।
নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ।
নমো জঘন্যায় চ বুধ্নায় চ ।।[৫]

১ আরোগ্য—১।
২ মধুসঞ্চায়ী—৩, প্রহাসিনী।
৩ ঋগ্বেদ—১।২৭।১৩।
৪ অথর্ব—৬।২।২০।২।
৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১৬।৩২

ছোট বড় উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকলেই ঋষির প্রণামের বিষয়ীভূত হয়েছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র ব্রহ্মের লীলা অনুভব করেছেন যে ঋষি কবি তিনিও বারংবার প্রণাম জানিয়েছেন এই পৃথিবীকে—প্রকৃতিকে—বিশ্ববাসী মানুষকে।

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিক জনের লহো নমস্কার।

* * * *

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহো নমস্কার।[১]

আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক অপরাধ।
ললাটেতে রাখো আমার পিতার আশীর্বাদ।
বাতাস তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ।
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্বাদ।
মাটি, তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্বসাধ।
গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো
পিতার আশীর্বাদ।[২]

যে ব্রহ্মস্বরূপ সূর্যের মাঝে কবি নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকে ও তিনি প্রণাম জানিয়েছেন।

১ গীতালি—১৮।
২ গীতাঞ্জলি—৪৮।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।[১]

ঋষি কবি ও জগতের প্রাণ এবং চক্ষুস্বরূপ সূর্যকে প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন।

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে
মহো দেবায় তদ্ধৃতং সপর্যত।
দূরে দৃশে দেবজাতায় কেতবে
দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥[২]

—মিত্র বরুণের (সুতরাং সকল চরাচরের) চক্ষুস্বরূপ (প্রকাশক তেজঃস্বরূপ) স্বয়ং প্রকাশমান তেজরূপ, দেবগণের অনুগ্রহে জাত (অথবা দেবগণের জন্মের হেতুভূত), আকাশের পুত্র, ত্রিকালস্থ প্রাণিগণের দ্রষ্টা (অথবা দূর থেকে জগৎ দর্শনকারী) সূর্যকে প্রণাম। তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে স্তুতি কর।

কবি পৃথিবীর ধূলিতে সত্যের মূর্তি উপলব্ধি করেছেন বলেই পৃথিবীর ধূলিতে প্রণতি রেখেছেন:

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।[৩]

ভালো মন্দে মেশানো এই পৃথিবীকে ও তিনি প্রণাম জানাতে ভোলেন নি

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে।
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।[৪]

চিরন্তন মানুষের জন্যও কবি প্রণাম রেখেছেন:

মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,

১ সাবিত্রী—পূরবী।
২ শুক্ল যজুর্বেদ—৪।৩৫।
৩ আরোগ্য—১।
৪ পত্রপুট—৩।

অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চির মানবের—
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত আলোকে
তাঁহাদের করি নমস্কার।[১]

অস্ত সিন্ধু থেকে নব-জীবনের উদয় গিরিকেও প্রণাম নিবেদন করেছেন কবি।

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয় গিরি শিখর পানে
অস্ত মহাসাগর তট হতে—

* * * *

অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তারি মাঝে পেয়েছি সুধা,—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।[২]

মহাযাত্রার অপেক্ষায় কবি সকলকে প্রণাম জ্ঞাপন ক'রে ছুটী প্রার্থনা করেছেন :

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই—
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।।[৩]

১ জন্মদিনে—১৭।
২ প্রণতি—বীথিকা।
৩ পূজা—৫৯৮।

অনুকথন

রবীন্দ্র-চিন্তায় তথা রবীন্দ্রকাব্যে ভারতীয় ঋষিদের ধ্যান ধারণার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা করা হোল। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বেদ-উপনিষদ ইত্যাদির তত্ত্ব গুলিই যদি রবীন্দ্র-চিন্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা কোথায়? কেবল ঋষি-লব্ধ জ্ঞানের রাজ্যেই কি তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ? না তা নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোন মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে নি। তাঁর মনন-শক্তি কোন পুর্ব-সূরীর চিন্তার মধ্যেই আবর্তিত হয় নি। দৃষ্টি তাঁর সর্বব্যাপক,—তাই তিনি দ্রষ্টা—ঋষি। ঠিক এই কারণেই ভারতীয় ঋষির সঙ্গে তাঁর স্বাজাত্য। ঋষির সত্যসন্ধ দৃষ্টি সকল আবিলতা, তুচ্ছতা সংকীর্ণতার অতীতচারী। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে তাঁর চিন্তার উপরে প্রভাব পড়েছে দেশী বিদেশী অগণিত কবির—সাহিত্যিকের—চিন্তা নায়কের। এ কথা স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হন নি সত্যব্রত রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, "এখনও আমার বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড জীবনের যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে, অন্যত্র গূঢ়ভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে।"[১]

বিদেশী চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে কবি বলেছেন, "আমার চিন্তার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা আমি কেমন করে বলবো? সর্বযুগের সর্বদেশের তপস্যাকে আমি শ্রদ্ধা করে তাদের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, নির্জীব পাথর।"[২]

পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে প্রসংগতঃ এই গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একখানি পৃথক গ্রন্থ রচনার অপেক্ষা রাখে। তবে পাশ্চাত্য-প্রভাব স্বীকার করেও যে কথা বারবার বলা হয়েছে সে কথারই

১ জীবনস্মৃতি।

২ আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন কর্তৃক ধৃত কবির উক্তি; গ্রন্থভূমিকা—বলাকা কাব্য পরিক্রমা।

পুনরুল্লেখ ক'রে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় মণীষার ধ্যান ধারণাই রবীন্দ্র-মানসে সর্বাতিশায়ী প্রভাব সঞ্চার করেছে। বেদ-উপনিষদ্ ছাড়াও বৈষ্ণব কবি ও দার্শনিক, সংস্কৃত কবি বাল্মীকি, ব্যাস এবং কালিদাস এবং বাঙালী কবি বিহারীলালের প্রভাব সম্পর্কেও কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রভাব সম্পর্কেও সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাঙ্গালী কবি মধুসূদন, ভারতের মরমী কবি সাধক, কবীর দাদু প্রভৃতির, বাঙ্গালা শাক্ত পদাবলীর, বাউল গানের প্রভাব ও রবীন্দ্র সাহিত্যে কম নয়। এ গুলিরও ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন। অতীত মানবের বিশেষতঃ অতীত ভারতের সমগ্র সাধনাই রবীন্দ্রনাথ আত্মসাৎ করেছেন। অতীত রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন অতীতকে সম্বোধন করে :

তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।[১]

আমাদের পুর্বপুরুষের সকল সঞ্চয়ই কবির জীবনে এসে পৌছেছে।

তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হ'য়ে বও
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও
কথা কও।[২]

কিন্তু অতীত চিন্তার প্রভাব পড়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা হারিয়েছেন এমন কথা ত নয়। রবীন্দ্র-কাব্যের বৈচিত্র্য এত বেশী,—তাঁর চিন্তার প্রবাহ এত বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত যে কোন বিশিষ্ট চিন্তার মধ্যে আবর্তন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়,– সে কথা রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠক মাত্রেই জানেন। তা ছাড়া পৃথিবীর কোন মহৎ সাহিত্য-স্রষ্টার চিন্তায় পুর্বসূরীর প্রভাব না পড়েছে? পুর্বসূরীর প্রভাব পড়লেই স্রষ্টার মৌলিকতার হানি হয় না। স্বীকরণের নামই প্রতিভা। প্রভাব মেনে নিয়েও স্বকীয়তার অভিপ্রকাশই মহৎ প্রতিভার ধর্ম।

---

১ অতীত,—উৎসর্গ।
২ ঐ ঐ।

স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্র-চিন্তা তথা মানসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে এই প্রভাব সর্বত্র সচেতন ভাবে না-ও এসে থাকতে পারে। কবির মানসধর্মই ঋষির মানস ধর্মের অনুরূপ।

এই প্রভাব কবির কাব্য-আস্বাদনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এমন কথাও যথার্থ নয়। এ কেবল বিচারের কথা—আলোচনার কথা। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক এবং সমালোচক মাত্রেই কাব্যের ভেতর থেকে তত্ত্ব খুঁজে বার করেন। যিনি তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কাব্যরস আস্বাদন করতে চান, তিনি তাই করুন। রবীন্দ্র-কাব্য অফুরন্ত রসের নির্ঝর। যাঁর যেমন মানস-প্রবণতা,—তিনি সেই ধরণেরই কবিতা পাবেন। কাব্যের লক্ষ্যই হোল রসসৃষ্টি। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—কাব্যবিচারে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। রসবর্জিত রচনা বা বাক্য সাহিত্য পদবাচ্য নয়। রস-সংযুক্ত বাক্য পাঠকের চিত্তে রস-সঞ্চার করে আনন্দ সৃষ্টি করে। তাই কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দ পরিবেষণ। তবে যদি তার মধ্যে তত্ত্ব থাকে তো থাক। রচনা রসোত্তীর্ণ হ'লেই অর্থাৎ রসগ্রাহী পাঠক-সমাজকে আনন্দ দিতে সক্ষম হ'লেই তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "কাব্যের গুণ এই যে, কবির সৃজনীশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া। কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবার মাত্র কেহ বা হাউয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে।.........অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদি বা কোন শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না।.........আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভ ফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ্ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধ নেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া

থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না।"[১]

রবীন্দ্রনাথ কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে যা বলেছেন তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। সকল শ্রেণীর পাঠকই নিজ নিজ রুচি এবং বুদ্ধি অনুসারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারেন। কাব্য বিচারে রসের প্রাধান্য স্বীকার করতেই হয়। তবু মনে হয়, এ কথা সত্য যে রবীন্দ্র-কাব্যের সামগ্রিক রস আস্বাদন করতে হ'লে ভারতীয় ঋষির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। ভারতীয় ঋষির চিন্তাধারায় অনভিজ্ঞ পাঠক রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদনে সমগ্রভাবে না হ'লেও অংশতঃ বঞ্চিত হবেন বলে মনে হয়। কারণ এ প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই প্রসংগে ডঃ বিমলাকান্তি সমাদ্দারের মন্তব্যটি স্মরণীয়: "আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আলোচ্য প্রভাব নির্দেশ করিতে গিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভাকে যেন কোন স্থলেই না অস্বীকার করিয়া বসি, আবার যেখানে প্রভাব প্রকৃত পক্ষে বর্তমান, সে ক্ষেত্রে যেন রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা হানির ভয়ে এবং তাঁহার কাব্যের প্রতি আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক অনুরাগের ফলে উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে দ্বিধাগ্রস্ত না হই।

. রবীন্দ্রনাথ যাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রতিভার দ্বারা আপনার সম্পদ করিয়া তুলিয়াছেন তাহাকে বহুগুণ মূল্যবান করিয়া নূতন সৃষ্টিরূপে পাঠককে উপহার দিয়াছেন।"[২]

১ কাব্যের তাৎপর্য—পঞ্চভূত।

২ ভূমিকা—রবীন্দ্র কাব্যে কালিদাসের প্রভাব।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রকান্তরে	প্রকারান্তরে	১২	২
সূর্য	সূর্যঃ	২৪	১
তস্মাওৎ	তস্মাত্তৎ	৩৫	৪
বর্‌ণাণাং	বরাণাং	৩৮	১৩
কিঞ্চ	কিঞ্চ	৪৩	৯
অস্ত	অণ্ড	৫৯	৭
আত্মন্তর্হৃদয়ে	আত্মান্তর্হৃদয়ে	৬৮	২২
Thurs	Thus	১২০	৮
নেই	সেই	১৬৫	১৭
শূজার	পূজার	১৯৪	১৫
অন্ধকার দূর	অন্ধকার দূর কর	২১৫	১৫
র্ণে	বর্ণে	২১৭	৭
কুলনা	ঝুলনা	২২৮	১২
সস্বরূপে	স্বস্বরূপে	২৩৩	১৯
অম্নুভ্যাহণু	অণুভ্যোহণু	২৪৬	২
পৃথিব্যা	পৃথিব্যো	২৫৩	১৮
তামিস্র	তমিস্র	২৮০	৬

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঋগ্বেদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

২। ঐ—৺রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

৩। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ—মহামহোপাধ্যায় ৺দুর্গাচরণ—সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত দেবসাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত।

৫। ঈশ কেন কঠোপনিষৎ—ঐ—ঐ

৬। ঐতরেয়োপনিষৎ—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি সম্পাদিত শ্রীগুরু লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

৭। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—স্বামী অভেদানন্দ সম্পাদিত।

৮। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত। ১ম ও ২য় খণ্ড।

৯। মাণ্ডুক্যোপোনিষৎ—রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত। উৎসব অফিস, ১৬২নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

১১। সাংখ্যকারিকা—সম্পাদক বিহারীলাল সরকার। তারক ভবন, পি ৩৭৭ মনোহরপুকুর রোড্ থেকে প্রকাশিত।

১২। চণ্ডী—৺শ্যামচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত। ১১শ সং। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩। বিষ্ণুপুরাণ—৺বিহারীলাল সরকার কর্তৃক বঙ্গবাসী প্রেস হইতে ১২৯৪ সালে প্রকাশিত।

১৪। বরাহপুরাণ।

১৫। বামন পুরাণ।

১৬। বায়ুপুরাণ, উত্তরভাগ।

১৭। প্রপঞ্চসারতন্ত্রম্—আর্থার এভ্‌লন সম্পাদিত।

১৮। সারদাতিলকম্।—ঐ।

১৯। বহ্বৃচোপনিষৎ—ঐ।

২০। মহাভারতম্—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রণীত, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮৩০ শকাব্দে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত।

২১। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—মহাকবি কালিদাস।

২২। কুমার সম্ভবম্—ঐ

২৩। শতপথ ব্রাহ্মণ।

২৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

২৫। বাল্মীকি রামায়ণম্।

২৬। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

২৭। শুক্লযজুর্বেদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

২৮। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৺দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত দেবসাহিত্য কুটীর থেকে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত।

২৯। বৃহদ্দেবতা।

৩০। অথর্ববেদ—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৩১। প্রাণতোষিণীতন্ত্রম্—বসুমতী সং।

৩২। কূর্মপুরাণ—পূর্বভাগ।

৩৩। বৃহৎ সংহিতা—বরাহমিহির।

৩৪। দেবী ভাগবত।

৩৫। পৃথিবীর ইতিহাস ১ম খণ্ড—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত, হাওড়া পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয় হইতে ১৩১৬ সালে প্রকাশিত।

৩৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

৩৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ৮ম সং, ১৩৫৬, দাসগুপ্ত এণ্ড কোং প্রকাশিত।

৩৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৯। বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত ৪র্থ সং, ১৩৫৯, এ. মুখার্জী প্রকাশিত।

৪০। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—তারকচন্দ্র রায়।

৪১। চৈতন্য চরিতামৃত।

৪২। সারদা মঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী সাহিত্য পরিষদ সং।

৪৩। নিসর্গ সন্দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী।

৪৪। রবীন্দ্র মানস—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার।

৪৫। বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী।

৪৬। বলাকা কাব্য পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেন, ১ম সং ১৩৬৯, এ. মুখার্জী এণ্ড্ কোং।

৪৭। রবীন্দ্রনাথ—অজিতকুমার চক্রবর্তী—১৩৫৩, বিশ্বভারতী।

৪৮। রবীন্দ্র দর্শন—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৯। রবীন্দ্র কাব্যে কালিদাসের প্রভাব—ডঃ বিমলকান্তি সমাদ্দার। ১ম সং, ১৩৬৫, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্।

৫০। রবিরশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বভাগে ৪র্থ সং, এ. মুখার্জী প্রকাশিত।

৫১। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ১ম, প্রমথনাথ বিশী, ২য় সং, মিত্রালয়।

৫২। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১ম সং ১৩৬০, ওরিয়েন্ট্ বুক কোং প্রকাশিত।

৫৩। দেশ পত্রিকা, ১৩ই জানুয়ারী—১৯৬৮।

৫৪। The great philosophies of the world—by C. E. M. Joad.

৫৫। Cretive Evolution-Translated by A. Mitchell,

৫৬। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র খণ্ড খণ্ড রচনা এবং সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি

বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা, ও ঋষি ও প্রসিদ্ধ চরিত্র

রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী—

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—

বিবিধ—

ইংরাজী—